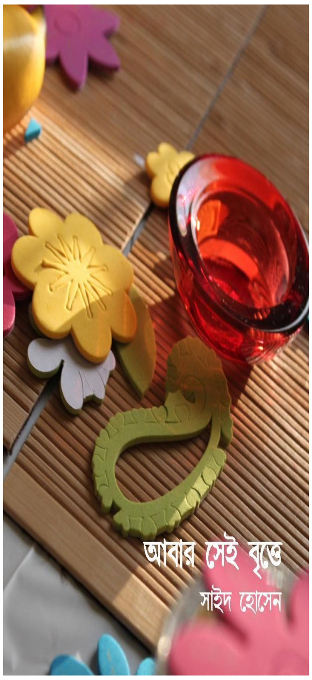
আবার সেই বৃত্তে
সাইদ হোসেন

আবার সেই বৃত্তে

**

সাইদ হোসেন

Date of first edition publication: September, 2011

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
On line publication at URL: www.sayedhossain.com

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন
Design and coverpage : Sayed Hossain

© *Abar Shei Britte*, A bengali novel by Sayed Hossain. 2011.Dallas. USA

Contact me : sayed.hossain@yahoo.com
My personal homepage: www.sayedhossain.com

।।১ ।।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি

গরমে ঘ্যাস ঘ্যাস করছে চারিপাশ । থেকে থেকে ঘেমে উঠছে সবাই । বার বার রুমালে মুখ মুছছে লোকজন । মানুষের পাশাপাশি নেড়ীকুত্তাগুলাও হাপিয়ে উঠেছে । থেকে থেকে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে ওরা অগভীর জলে । চো চো করে পানি খাচ্ছে দুই একটা । এক পশলা বৃষ্টি না হলেই না । সেই যে সূয্যি মামা পাখা মেলেছে আকাশের নীলিমায়, তার নামবার লক্ষণ নেই । দগদগে আলোয় ঝলসে যাচ্ছে চারিপাশ ।

একটা রিকসা এসে দাঁড়ালো । আমি বললাম, যাবেন ?
- কৈ যাবেন, আপা ?
- ইউনিভার্সিটি ।
- উঠেন ।

আমি আসলে কলা ভবনে যাব কিন্তু কলা ভবন বললে অনেক রিকসায়ালা চিনবে না ফলে অসুবিধেয় পড়তে হবে । তবে ইউনিভার্সিটি বললে যে কেউ পৌছে দেবে । কেন কলা ভবন চিনবে না, এর কারণ আমার জানা নেই তবে মাঝে-মধ্যে কৌতুহল জাগে কিন্তু কৌতুহলটা বেশিক্ষণ থাকে না, ফলে উত্তরটা আজও জানা হয়নি ।

দেরি না করে উঠে বসলাম । ইচ্ছে করে বাড়ির গাড়ি নেই না কারণ রিকসায়ালারা ভির-ভাট্রা ডিঙিয়ে অনায়েসে চলে আসতে পারে তবে যেদিন খুব বৃষ্টি থাকে, সেদিন গাড়ি নিতেই হয় । আমার বাড়ি থেকে ইউনিভার্সিটি খুব একটা দুরে নয় । সব ঠিক থাকলে চল্লিশ মিনিটে পৌছানো যায় । তাকিয়ে দেখি রিকসায়ালার পিঠে সাদা সাদা বালু, এর মানে ঘাম শুকিয়ে লবন হয়ে গেছে । ঠিক করলাম পাঁচ টাকা বেশি দেবো ।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টে । দুই মাস হলো ক্লাস শুরু হয়েছে । আজ দুটায় হাফিজ স্যারের ক্লাস আর সেটা ধরতেই আমার তোড়জোড় । ঘড়িতে দেখলাম বেলা একটা । রাস্তায় জ্যাম না হলে ক্লাসের আগে পৌছুতে পারবো । আর দেরি হলেই গেল । হাফিজ স্যারের নিয়ম হলো পনেরো মিনিটের বেশি দেরি হলে কেউ ক্লাসে ঢুকতে পারবে না ।

আমার বাসা ঢাকার সিদ্বেশ্বরীতে । মালিবাগ পার হয়ে একটু এগুলেই সিদ্ধেশ্বরী । আমি হলফ করে বলতে পারি, ঢাকা শহরের বড় অংশের বাস এই সিদ্বেশ্বরীতে । সকাল হলেই গাড়ির প্যা-প্যা শব্দ শুরু হয় আর সেটা চলে মধ্য রাত অবধি । এই সিদ্বেশ্বরীতেই আমার বাবা ছোট্র বাড়ি করেছেন ।

ভিকারুন্নেসা সকুলের পাশ দিয়ে কাকরাইল মসজিদকে ডানে রেখে রিকসা এগিয়ে চলেছে । ঘড়িতে দেখলাম দুটা বাজতে বিশ মিনিট । এর মানে হাফিজ স্যারের ক্লাস ধরতে অসুবিধেয় পড়তে হবে না । ইচ্ছে করে রিকসার হুড ফেলে দিয়েছি যেন রৌদ্রের উত্তাপ এসে না পড়ে । অবশ্য রিকসায়ালাদের সে সুযোগ নেই । কি রৌদ্রু, কি বৃস্টি, ওরা খোলা মাথায় ঘুরে বেড়ায় শহরময় ।

ক্লাস শুরুর পনের মিনিটের মাথায় হাফিজ স্যার দরজা বন্ধ করে দিলেন । এর মানে এখন আর কেউ ঢুকতে পারবে না । আমরা টান টান হয়ে বসে আছি । স্যার আমাদের কোম্পানি ফরমেশন পড়াচ্ছেন আর ফাঁকে ফাঁকে উদাহরণ দিচ্ছেন । এত সুন্দর করে উদাহরণ দেন যে, পড়াটা গেথে যায় ভেতরে ।

এক ছাত্র বিনয়ের সাথে বললো, স্যার, এই জায়গাটা যদি আবার বলতেন ?
স্যার হেসে বললেন, আপনি এত সংকোচ করছেন কেন ? যেটা বুঝবেন না, বলবেন । আমি বুঝিয়ে দেব ।

হাফিজ স্যার আমাদের আপনি করে বলেন । প্রথম প্রথম খুব সংকোচ লাগতো কিন্তু পরের দিকে সয়ে গিয়েছিল । তবে ক্লাসে কেউ কথা বললে তার নিস্তার নেই । তখন আপনি-তুমি সব একাকার হয়ে যায় ।

হাফিজ স্যার যখন সব কিছু গুছিয়ে এনে একটা সামারি বলবেন, তখনি বারান্দায় হুলস্থুল । কি ব্যাপার ? আমরা জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছি । তাকিয়ে দেখি একদল ছেলে মিছিল নিয়ে আসছে । ওদের চিৎকারে ঢাকা পড়ে গেল সব । হাফিজ স্যার চেয়ারে এসে বসলেন মাথা নিচু করে । কিছুক্ষন পর মিছিলটা চলে গেল স্যার বললেন, কি যেন পড়াচ্ছিলাম ?
এক ছেলে দাঁড়িয়ে বললো, কোম্পানি যখন ডিভিডেন্ট দেবে, তখন তাকে কোম্পানি আইন মেনেই দিতে হবে ।
- ইয়েস, বলে স্যার আবার পড়াতে শুরু করলেন ।

ক্লাস শেষ হলো বেলায় চারটায় । ক্লাস থেকে বেরিয়ে হাঁটা দিয়েছি । এখনো কারো সাথে পরিচয় হয়নি তবে অনুমান করি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা একশর কাছাকাছি । অর্ধেকের বেশি ছেলে, বাকি সব মেয়ে । এই একশো ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হয়েছে প্রথম বর্ষ ফিন্যান্স ।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বসে লেকচারটা ঠিক করে নিচ্ছি । ক্লাসের তাড়াহুড়ার মধ্যে সব লেখা যায় না । এখন ঠিক না করলে পরে ভুলে যাব । আমার আবার আধা-কাজ একদম ভাল লাগে না । পড়াশোনা যখন করছি, তখন ভাল করেই করবো ।

আপনার ক্লাস নোটটা দেখতে পারি ?

তাকিয়ে দেখি একটা হ্যাংলা-পাতলা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে । সম্ভবত আমার ক্লাসের । ছেলেটা এত লম্বা যে, ওর মাথার ছায়া আমার পায়ের উপরে এসে পড়ছে ।
ছেলেটা বলতে লাগলো, লেকচারের কয়েক জায়গা লিখতে পারিনি সময়ের অভাবে । নোটটা যদি দিতেন, তো দেখতাম ।

আমি নোটটা এগিয়ে দিলাম ।

ছেলেটা আমার পাশে বসে পড়লো । বললো, আমি আপনার ক্লাসেরি একজন, আমার নাম মিশকাত ।

- বাহ্, সুন্দর নাম তো । এরকম নাম তো কখনো শুনিনি ?

মিশকাত হেসে বললো,

ইয়েস, একটু আন-কোমন । যেই শোনে, সেই অবাক হয় । আমার বাবা শখ করে নাম রেখেছেন । আপনার নাম জানতে পারি ?

- আমি রুশা ।

মিশকাত বললো, আপনার নামের শেষের অক্ষর 'শ' না 'স' দিয়ে ?

এরকম প্রশ্ন শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলাম । বললাম,'শ' দিয়ে ।

- তাহলে শীত শীত ভাব আছে ।

- সেটা কি রকম, আমি হেসে জানতে চাইলাম ।

মিশকাত বলতে লাগলো, রুশ, রুশা, রুশো এসবের মধ্যে রাশিয়া, রাশিয়া গন্ধ আছে, আর রাশিয়া মানেই শীত । সাদা বরফের দেশ ।

আমি বললাম, আপনি কখনো রাশিয়া গেছেন ?

- না তবে সুযোগ পেলে যাব ।

- এত দেশ থাকতে রাশিয়া কেন ?

- কারণ হলো শীত । আমি কখনো বরফ পড়া দেখিনি তবে দেখতে যে দারুণ লাগবে, এখানে বসেই অনুমান করি ।

আমি বললাম, আপনার মিশকাত নামের মধ্যেও কিন্তু রাশিয়া রাশিয়া ভাব আছে ।

- ঠিক তাই । আপনিই ব্যাপারটা প্রথম আঁচ করতে পেরেছেন ।

আমি বললাম, এই মিশকাত নামের মাঝখানের অক্ষর 'শ' না 'স' ?

হেসে দিল ছেলেটা । বললো, 'শ' দিয়ে কারণ আমার বাবা ইচ্ছে করেই 'শ' বসিয়েছেন যেন রাশিয়ার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা যায় ।

- কেন, রাশিয়ার সাথে যোগসূত্র কেন ? আমি বললাম ।

- রুশ ভাষা তত্বের উপর বাবা রাশিয়ায় পড়াশোনা করেছেন । দীর্ঘ এক যুগ ছিলেন বাবা রাশিয়াতে তারপর থেকে বাবা চেষ্টা করেন সব কিছুতে 'স' না দিয়ে 'শ' বসিয়ে দিতে ।

- আপনিও কি তাই করেন নাকি ?

- বাবার সাথে থেকে থেকে আমারও রাশিয়া প্রীতি জন্মেছে । আমরা দুজনি রাশিয়ান কালচার সেন্টারে যাই । ওদের গান-বাজনা শুনি । রাশিয়ানরা কিন্তু খুব ভাল । বরফের দেশের মানুষরা একটু হাবাগোবাই হয় ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

- যেমন ধরুন সহজ সরল । খুব সহজে কমপ্লেইন করে না, সুখী সুখী ভাব ।

- কিভাবে বুঝলেন ওরা সুখী ?

- সুখী মানুষের সাথে থাকলেই বোঝা যায় ।

- ঠিক আছে, সুখী মানুষের একটা সিমটম বলুন ।

মিশকাত বলতে লাগলো, একজন সুখী মানুষ কখনো বলবে না তার এই নেই, সেই নেই । তার যা আছে, তাতেই সে টয়টুম্বুর ।

- তাহলে তো সাধু-সন্নাসীরাই সব চেয়ে সুখী ?

- ঠিক তাই, বলে ছেলেটা হেসে দিল ।

মনে হলো ছেলেটা একটু বেশিই খুশি হয়েছে কিন্তু মিশকাতের দেয়া সুখের সংজ্ঞাটা যে নূতন কিছু নয়, সেটা বলতে নিয়ে বললাম না ।

আমি একটু থেমে বললাম, আপনি কি রাশিয়ার ভাষা জানেন ?

- কিছু কিছু । বাবার কাছে যেটুকুন শিখেছি ।

- আর রুশ সাহিত্য ?

মিশকাত বলতে লাগলো, বাবার লাইব্রেরীতে যেটুকু পড়েছি । লিয়-টলস্টয় পড়েছি সব চেয়ে বেশি । আপনারও নিশ্চয় পড়া আছে ?

আমি বললাম,

শুধু আনা-কারনিনা পড়েছি । তবে ছোটবেলায় দেখতাম বাবা রাশিয়ার বই-পত্র নিয়ে আসতেন । এর মধ্যে উদয়ন পত্রিকা ছিল একটা, যতদুর মনে পড়ে, মস্কো থেকে বের হতো ওগুলো । মিশকাত হেসে বললো, আমার বাসা উদয়ন দিয়ে ঠাসা । উদয়নের প্রতিটি কপি পাবেন বাবার সংগ্রহশালায় ।

আমি বললাম, ঐ পত্রিকার কয়েকটা সংখ্যা পড়েছি । পত্রিকা খুললে আলু আর গমের কথা বিস্তারিত দেয়া থাকে । ওরা মনে হয় আলু-গম খেতে খুব পছন্দ করে ?

- ঠিক তাই, বলে মিশকাত হেসে দিল ।

আমি বললাম, এখনো কি উদয়ন বের হয় ?

- রাশিয়া ভেঙে যাবার পর ওসব আর বের হয় না । আগে যেমন রাস্তায় বেরুলে বা লাইব্রেরিতে রাশিয়ার বইয়ে ঠাসা থাকতো, এখন সেসবের বালাই নেই । তবে নীলক্ষেতের পুরোনো দোকানে ম্যাক্সিম গোর্কি পেলেও পেতে পারেন । অবশ্য বাবার লাইব্রেরিতে সবি পাবেন ।

আমি বললাম,

একটা জিনিষ খেয়াল করেছেন ? রাশিয়ানদের বাংলা লেখার ঢং কিন্তু আমাদের মতন না । একটু অন্য ধাচের, কিন্তু মিস্টত্বে ভরা । উদয়ন লেখার ঢং আমাকে আজও মুগ্ধ করে রেখেছে ।

মিশকাত হেসে বললো,

আপনি তো দেখছি খুব ভাল জানেন রাশিয়া সম্পর্কে । আমার বাবা খুব খুশি হতেন আপনার সাথে আলাপ করলে । রাশিয়া নিয়ে কথা উঠলে বাবা সব কাজ ফেলে গল্প শুরু করে দেয় ।

আমি একটু থেমে বললাম, আপনাদের পরিবারে রাশিয়ার এত কদর, আপনি নিজেও বরফ পছন্দ করেন, রাশিয়া গেলেন না কেন পড়তে ?

- বাবাও তাই চেয়েছিলেন কিন্তু মার জন্য হয়নি । মা আমাকে হাতছাড়া করতে দেননি ।

- আর আপনারও ইচ্ছে ছিল না সেই সাথে ?

- ঠিক তাই, বলে হেসে দিল ছেলেটা । বললো,

আপনার ক্যাপচার করার ক্ষমতা কিন্তু খুব ভাল, আগাম বলতে পারেন । আমার ইচ্ছে দেশে যেটুকু পড়া যায় পড়বো, তারপর বাইরে । ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেহেতু গতি হয়ে গেল, তাই আপাতত কোথাও যাচ্ছি না ।

কথা বলার ফাঁকে খেয়াল করলাম ছেলেটার জামার উপরের বোতাম খোলা । আমার আবার এসব একদম পছন্দ না । জামা যদি পড়তেই হয়, তবে ভাল করেই পড়বো । ভেতরে ভেতরে রেগে যাচ্ছি কিন্তু সেটা প্রকাশ করলাম না ।

মিশকাত বলে উঠলো, এই নিন আপনার নোট । যেটুকু দেখা যায় দেখেছি । আপনার অনেক সময় নিয়ে ফেললাম ।

- আপনি চাইলে কাল ফেরত দিতে পারেন । আমার তাড়া নেই ।

- ধন্যবাদ, তার প্রয়োজন দেখছি না । আচ্ছা চলি ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

ছেলেটা মাথা নুয়ে চলে গেল ।

মিশকাত হাঁটতে শুরু করেছে । পেছন থেকে দেখলাম ছেলেটা আসলেই লম্বা । এত লম্বা আর শুকনো মানুষ খুব কম চোখে পড়ে এদেশে ।

।।২।।

সোমা

অপারজয় বাংলাকে পেছনে ফেলে হাঁটা দিয়েছি । ওদিকে এগিয়ে রিকশায় উঠবো । একটা মেয়ে সাই করে হেঁটে গেলো । কিছুদুর গিয়ে ফিরে এসে বললো, আমি সোমা । তোমার ক্লাসে পড়ি । আসো হ্যান্ড-শেক করি, এই বলে হাত বাড়িয়ে দিলো ।

আমি কিছুটা থতমত খেয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি ।

সোমা বললো, তোমার নাম কি ?

- রুশা ।

- বাহ্, সুন্দর নাম তো, চটপটি খাবা ? প্রথম দিন চটপটি দিয়ে শুরু করি ।

- চটপটি কেন ? আমি হেসে বললাম ।

- চটপটি হলো মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ । তাই চটপটি দিয়ে শুরু করলে অনেক দিন মনে থাকবে ।

চটপটির কথা শুনে আমার মুখ ভিজে এলো, কিন্তু সেটা গোপন করে বললাম, চলো, খাই ।

অপরাজেয় বাংলাকে পেছনে একটু এগুলেই চটপটির দোকান । দোকানিরা ছোট ছোট চাকার গাড়িতে চটপটি বিক্রি করছে ।

দুই প্লেট চটপটির অর্ডার দিল সোমা । বললো, ক্লাসে কারো সাথে কথা হয়েছে ?

আমি বললাম, না । পরক্ষণেই মনে হলো মিশকাতের কথা । কথা ঘুরিয়ে বললাম, হ্যাঁ, একজনের সাথে কথা হয়েছে । নাম মিশকাত ।

সোমা হেসে বললো, ভাল ছেলে তবে আউলা ।

- সেটা কি রকম ?

সোমা বলতে লাগলো,

মিশকাতরা আগে আমাদের পাড়াতেই থাকতো । পরে চলে গেছে অন্য জায়গায় । তখন থেকেই ওকে চিনি । একটু Immature । আলগা কথা বেশি বলে ।

- আলগা কথা মানে কি ?

সোমা বলতে লাগলো,

তোমাকে এসে হয়তো বলবে, রুশা চলো তোমাকে তোলারাম কলেজ দেখিয়ে আনি অথচ বাছ-বিচার করবে না, এটা তোমাকে বলা যায় কিনা ।

আমি বললাম, সত্যি সত্যি বলবে নাকি ?

- হ্যাঁ বলবে । প্রমাণ চাও ?

- হ্যাঁ চাই ।

সোমা বলতে লাগলো, আমরা যখন এক পাড়ায় থাকতাম, তখন আমরা সকুলে পড়ি । একদিন মিশকাত এসে বলে, আব্বা-আম্মা ঝগড়া করছে । চল তোমাকে দেখাই ।

- তখন তুমি কি বললা ?

সোমা হেসে বললো,

কি আর বলবো ? অন্য দিকে হাঁটা দিলাম আর মিশকাত হা করে তাকিয়ে রইলো । ও বুঝতে চেস্টা করতে লাগলো কেন আমি ওর ডাকে সাড়া দিলাম না । অবশ্য এখন অনেক maturd হয়েছে, আলগা ভাবটা নাই । ওর বাবা-মা খুব ভাল মানুষ । ওরা দুই ভাই ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, তাহলে তো ওকে এড়িয়ে চলাই ভাল ?

সোমা সাথে সাথে বলে উঠলো,

না, সে ধরণের কিছু না, যেটা তুমি ভাবছো । একটু উডু উডু, এই আর কি । সকুল ছুটির পর যখন ছেলেরা ফুটবল খেলতে যায়, তখন দেখতাম ও রাস্তায় হাঁটছে । একা একাই হাঁটে । একদিন আমি আর বাবা মগবাজার যাচ্ছি । দেখি রাস্তার পাশে জটলা পাকিয়ে কবিরাজ ঔষধ বিক্রি করছে । তাকিয়ে দেখি আমাদের মিশকাত জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে । হা করে গিলছে কবিরাজের কথা ।

আমি বললাম, ওর বাবা-মা কিছু বলে না ?

- না । আর সে জন্যই তো ঐ রকম । তবে মাথা খুব ভাল । চেষ্টা করলে অনেক ভাল করতে পারতো ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । মনে মনে ঠিক করলাম এর পরের বার দেখা হলে avoid করবো । কখন আবার বলে বসবে, চলেন আপনাকে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনি । ভাগ্যিস আজ নোটটা দেয়নি । তাহলে ফেরতি পেতাম না ।

আমি চুপ হয়ে আছি দেখে সোমা বললো, মিশকাত ছাড়া আর কারো সাথে কথা হয়েছে ?

- না ।

সোমা বলে উঠলো, আমাদের ক্লাসের ছেলেগুলো যেন কেমন ? একেবারে বোকা ।

- কেন, বোকা হবে কেন ?

- দেখনা কেমন হা করে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে । মনে হয় কখনো মেয়ে মানুষ দেখে নাই ।

আমি হেসে দিলাম । দেখলাম সোমাও সোমাও হাসছে দাত-মুখ বের করে ।

আমাদের হাসি থামলো অনেকক্ষন পরে ।

সোমা বললো, বিকেলের ক্লাস যেন কখন ?

- বিকেল চারটায় ।

- দুপুরে কৈ খাবে ?

- ঠিক বলতে পারছি না ।

- চল, টিএসসি তে খাই । তুমি আমার মেহমান ।

আমি কিছু বললাম না । মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

টিএসসিতে খেতে বসেছি আমি আর সোমা । আজই প্রথম টিএসসি তে বসা । এর আগেও কয়েকবার আসা হয়েছে । তখন জানতাম না এখানে খাওয়া পাওয়া যায় । সোমা গিয়ে ভাত আর মুরগির মাংস নিয়ে এলো । আমরা খেতে শুরু করেছি ।

সোমা বললো, তোমার বাসা কোথায় ?

- সিদ্বেশ্বরী ?

- কে কে আছে ?

আমরা এক ভাই এক বোন । বাবা-মার কনফেকশনারির দোকান আছে সিদ্ধেশ্বরীতে । ওরা দোকান চালায় ।

- ভাই বোনদের মধ্যে তুমি বড় ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । বললাম, তুমি ?

সোমা বলতে লাগলো, আমরা এক ভাই এক বোন, তোমাদের মতনি । বাবার গাড়ীর ব্যবসা । গুলশানের চৌরাস্তায় আমরা থাকি । তোমার হবি কি ?

আমি বললাম, আমার কোন হবি নেই তবে মাঝে মধ্যে গান গাই ।

- তাই নাকি ? কি গান গাও সাধারণত ?

- গান গাওয়া বলতে যা বোঝায় তা ঠিক না । বাথরুম সিনগার বলতে পার ।

- বাথরুম সিংগারি হোক আর স্টেজ সিংগারি হোক, কি ধরণের গান গাও ?

আমি বললাম, লালন সংগীত ।

- এত গান থাকতে লালন কেন ?

- কোন কারণ নেই । ছোট বেলা থেকে গুণ গুণ করে গাই ।

আমার কথা শুনে সোমা চুপ হয়ে গেল । কিছুক্ষণ পর বললো, আমি অবশ্য লালন একদম পছন্দ করি না তবে তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে ।

- আমাকে পছন্দ হয়েছে মানে কি ?

- এর মানে হলো আমি তোমার সাথে দস্তি করতে চাই । আজ থেকে তুমি আমার দোস্ত, এই বলে সোমা হেসে দিল ।

আমিও হাসতে লাগলাম ওর সাথে সাথে ।

।। ৩ ।।

সকালের বৃষ্টি

ঘুম ভেঙেই দেখি বৃষ্টি । ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে আমার জানালার পাশ দিয়ে । থেকে থেকে জানালায় ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে । ঘড়িতে দেখলাম সকাল সাতটা । ফজরের নামাজ মিস হয়ে গেছে কিন্তু নামাজ পড়বার ব্যাপারটা থাকছেই । ফজরের সম্পর্কে বলা আছে, যদি ঘুম থেকে উঠতে দেরিও হয়, যখনি উঠবে, তখনি নামাজ পড়ে নেবে ।

তড়িঘরি করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেছি । দুই-দুই করে চার রাকাত নামাজ শেষ হয়ে এলো । নামাজ পড়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়েছি । মাথার কাছ থেকে চাদরটা চাপিয়ে নিলাম যেন শান্তিতে ঝড়-বৃস্টি দেখতে পারি । তাকিয়ে দেখলাম সিদ্বেশ্বরীর কাকগুলো গাছের আগডালে মাথা গুজে বসে আছে । থেকে থেকে হাক ছাড়ছে ওরা । নিচে রিকসায়ালারা লাল-নীল প্লাস্টিক পেচিয়ে এগুচ্ছে । রহিম বাবু দোকানের ঝাপ এখনো খুলেনি । কয়েকজনকে দেখলাম দোকানের সামনে দাড়িয়ে আছে ।

পাশের ঘরে মার ডাকাডাকি কানে এলো । মা ডাকলো রুশা, উঠেছো ?
আমি বললাম, না, । আরো ঘন্টা খানেক পরে উঠবো ।

মার তর সইলো না । কাছে এসে বললো, উঠবি না কেন ?
- বৃষ্টি পড়া দেখবো ।
মা হাসলেন । বললেন, যত ইচ্ছে দেখ । দেখা শেষ হলে আমাকে খবর দিস ।
আমি মাথা নাড়লাম ।

মনে এসে ভর করলো ক্লাসের কথা । আজ এগারটায় ক্লাস আছে । very important ক্লাস, না গেলেই না । ইশ, ক্লাসটা না থাকলে বাসায় বসে মুড়ি ভাজা খেতাম আর বৃষ্টি পড়া দেখতাম ।

বৃস্টি পড়া আর দেখা হলো না, উঠতেই হলো ।

খাবার ঘরে এসে দেখি মা আটার রুটি ভাজছে । আব্বা বসে আছে আমার অপেক্ষায় । আব্বার পাশে গিয়ে বসলাম ।

আব্বা বললো, কি রুশা, তোমার ক্লাস কেমন লাগছে ?

- ভাল ।

- কারো সাথে পরিচয় হয়েছে ?

আমি মাথা নাড়লাম ।

- কি নাম ? মা বললেন এদিক থেকে ।

- সোমা ।

আব্বা বললেন, আর কারো সাথে ?

- ইয়েস । একটা ছেলের সাথে ।

- কি নাম ?

- মিশকাত ।

মা বললেন, বাহ, সুন্দর নাম তো । একদিন নিয়ে আসিস ছেলেটাকে । দেখবো কেমন দেখতে । সোমাকেও আনিস ।

আমি বললাম, ঠিক আছে । মনে মনে বললাম, সোমাকে আনলেও আনতে পারি কিন্তু মিশকাতকে অবশ্যই না ।

মা রুটি বাড়িয়ে দিলেন । হাতে নিতেই গড়িয়ে পড়লো রুটিটা । কি মোলায়েম করে রুটি ভেজেছে আমাদের মা ।

আব্বা বলে উঠলেন, তোদের স্যাররা কেমন ?

- ভাল, খুব ভাল । হাফিজ স্যার সবচেয়ে ভাল ।

- কেন, হাফিজ স্যার সবচেয়ে ভাল কেন ?

আমি বললাম, হাফিজ স্যারের লেকচার সবচেয়ে আপ-টু-ডেট । প্রতি সেমিস্টারে উনি লেকচার নোট আপডেট করেন যেন স্টুডেন্টরা কারেন্ট তথ্যটা পেতে পারে ।

- কেন, অন্যান্য স্যাররা করেন না ?

আমি বললাম,

করেন হয়তো কিন্তু হাফিজ স্যারের মতন কেউ না । উনি অনেক খেটে-খুটে আমাদের পড়ান । এমনভাবে পড়ান যেন কেউ না বুঝে যেতে পারে । তবে স্যার খুব রাগি । আমাদের ভয়ে ভয়ে ক্লাস করতে হয় । কিন্তু তারপরেও স্যার আমাদের সবচেয়ে প্রিয় কারণ আমরা সবচেয়ে বেশি জানতে পারি স্যারের লেকচার থেকে ।

আব্বা সাথে সাথে বললেন,

কাজের মানুষরা একটু রাগিই হন । উনারা মনে করেন সবাই বুঝি তাদের মতন । কিন্তু সবাই আইনস্টাইন হলে আইনস্টাইন বলে কিছু থাকতো না । তোর স্যারকে আমার ছালাম দিস ।

- ঐ সব ছালাম-টালামের কথা হাফিজ স্যারকে বলা যাবে না । তুমি অন্য কিছু বলো ।

বাবা হেসে বললেন, ঠিক আছে, তোকে বলতে হবে না । আমার ছালাম আমি দিয়ে আসবো । এবার রুটি খা ।

আমি রুটি খেতে মন দিলাম ।

আমি ওদের একমাত্র মেয়ে, তাই আমার উপর ওদের অনেক দাবি । কখনো তুমি বলে, কখনো তুই । কখন কোনটা ডাকবে, এটা নির্ভর করছে মুডের উপর । যখন আমাকে আদর করে, তখন তুই, । আর রেগে গেলেই, তুমি । তবে আমাকে কখনো কস্ট দিতে চায় না ওরা । ওদের সাধ্য মতন আমাকে সাজিয়ে রাখে ।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরিতে এসেছি কারণ বিকেলে একটা ক্লাস আছে । বিকেলের ক্লাসটা সেরে বাড়ি ফিরবো ।

ক্লাস থেকে লাইব্রেরি পর্যন্ত আসতে কিছুটা ভিজে গেলাম । সাথে ছাতা ছিল বলে কাক-ভেজা ভিজতে হলো না । লাইব্রেরির চত্বরে ছাতাটা ভাজ করে ভেতরে ঢুকবার মুখে দেখি মিশকাত দাঁড়িয়ে আছে ।

আমি না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু মিশকাত এসে সামনে দাঁড়ালো । বললো, রুশা, একটু শুনেন ।

আমি ঘার ফিরিয়ে বললাম, কেমন আছেন ?

আমি ভাল, আপনি ?

- আমিও ভাল । তো কিছু বলবেন ?

মিশকাত বললো, আজকে দেরি করে ফেলেছি ক্লাসে আসতে । যদি কিছুক্ষণের জন্য নোটটা দিতেন তো চোখ বুলিয়ে নিতাম । কথা দিচ্ছি আর কখনো নোট চাইব না ।

আমি হেসে বললাম, দেরি করে ফেলেছেন বলে ক্লাসে ঢুকতে পারেন নি ?

- ইয়েস, বলে ছেলেটে মাথা নিচু করে ফেললো ।

মিশকাতের মাথা নিচু করা দেখে খুব হাসি পেল । সেটা গোপন করে বললাম, চলুন, ঐ টেবিলে গিয়ে বসি ।

লাইব্রেরির ভেতরে রেফারেন্স সেকশনের একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম ।

আমি বললাম, এই নিন লেকচার নোট ।

মিশকাত চোখ বোলাতে লাগলো এবং মেইন পয়েন্ট গুলো টুকে নিলো ।

ছেলেটা বললো, বার বার আপনার সময় নিচ্ছি । দেখবেন এরপর এসব হবে না, আজি শেষ ।

আমি মাথা উচু করে বললাম, ঠিক বলছেন তো ?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে হেসে দিল ছেলেটা । বললো,

প্রথম যেদিন আপনার সাথে পরিচয়, সেদিন মনে হয়েছে আপনার কাছে কিছু চাইলে কোন অসুবিধেয় পড়তে হবে না ।

- কেন, অসুবিধেয় পড়তে হবে না কেন ? মিশকাতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলাম ।

একটু থেমে গিয়ে মিশকাত বললো,

কেন অসুবিধেয় পড়তে হবে না, এর উত্তর আমার জানা নেই, অন্তত এই মূহুর্তে বলতে পারছি না । তবে কখনো জানতে পারলে আপনাকে জানাবো ।

আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম, জানতে পারি কেন ক্লাসে আসতে দেরি হলো ?

মিশকাত বললো,

আমি বাসে বা রিকশায় না উঠে হাঁটা দিয়েছিলাম আর সেখানেই ঘটলো বিপত্তি । ভেবেছিলাম এক ঘন্টায় পৌছে যাব কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি ।

আমি বললাম, আপনার বাসা নিশ্চয় কাছে নয় । সেখান থেকে হেঁটে আসবেন, এর মানে কি ?

হেসে দিল ছেলেটে । বললো, সে এক বিরাট কাহিনি । আপনাকে না হয় অন্য দিন বলি ?
আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।
মিশকাত কথা ঘুরিয়ে বললো, না, আজি বলি । কেন জানি বলতে ইচ্ছে হচ্ছে । আমার সবচেয়ে ভাল লাগে রাস্তা দিয়ে হাঁটা । যখনি স্কুল-কলেজ ছুটি হয়েছে, তখনি হাঁটতে বেরিয়েছি ।

সোমার কথা মনে পড়লো আমার । আমি ভেবেছিলাম সোমা এমনি এমনি বলছে কথাটা । এখন দেখছি ছেলেটে আসলেই আউলা । আমার আবার আউলা ব্যাপারটা একদমি পছন্দ না কারণ আমি সব কিছু পারফেক্টলি করতে চাই । কিন্ত মিশকাত আউলাই হোক আর আলগাই হোক, কেন জানি আমার উৎসাহ বেড়ে গেল ওর সম্পর্কে ।

আমি বললাম, যে কোন একদিন হাঁটার অভিঙতা বলতে পারেন ?
একটু থেমে মিশকাত বললো,

ইয়েস পারবো । শুনুন তবে, কলেজ জীবনের হাঁটার অভিঙতা দিয়ে শুরু করি, যেমন ধরুন, আজ কলেজ ছুটি । ঠিক করলাম সারাদিন হাঁটবো । তখন আমরা থাকতাম মতিঝিলে । ধরুন, মতিঝিল থেকে হাঁটা দিয়ে সোজা যেতাম রামপুরাতে । রামপুরার পেছনে তখন বড় বড় খাল ছিল । গিয়ে বসতাম খালের পারে । তারপর সেখানে ঘন্টা খানেক কাটিয়ে আবার হাঁটা দিতাম বাড়ির দিকে । দিনভর সুয্যি মামা মাথায় চড়ে থাকতো কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন, কখনো ক্লান্ত বোধ করিনি ।
আমি বললাম, এই ভর দুপুরে কেন হাঁটতেন, সেটা জানতে পারি ?
মিশকাত হেসে বললো,

কেন হাঁটতাম এর কারণ জানা নেই, তবে হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগতো । বলতে পারেন ঢাকা শহরের এমন কোন ফুটপাত নেই, যেখানে আমার পা পড়েনি ।
- এখনো কি এই অভ্যেস আছে ?
এবার মিশকাত চুপ হয়ে গেল । উত্তরটা দেবে কি দেবে না, তা নিয়ে ইতস্তত করছে ।
আমি বললাম, সরি, মনে হয় ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে ফেলেছি । আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি প্রশ্নটা ।

মিশকাত বললো,

না, ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন করেননি আর উত্তর দিতেও অসুবিধে দেখছি না । উত্তরটা হলো, ইয়েস, অভ্যেসটা এখনো আছে । কোনভাবেই ছাড়তে পারছি না ।

- এই যে ইউনিভার্সিটিতে আসেন, সেটা কি হেঁটেই ?

- মাঝে মাঝে । সব সময় নয় ।

আমি বললাম, বৃষ্টি নামলে কি করেন ?

মিশকাত বলতে লাগলো,

আকাশের ভাব খারাপ দেখলে রেইনকোট ব্যাগে ভরে নেই । তারপর বৃষ্টি নামলে সেটা চাপিয়ে দেই । বৃষ্টিতে হাঁটতে সবচেয়ে ভাল লাগে কারণ তখন ফুটপাত ফাঁকা হয়ে যায়, ফলে অনায়েসে পা ছড়িয়ে হাঁটা যায় ।

আমি বললাম, আপনার সর্বোচ্চ কতখানি হাঁটা হয়েছে ?

- গত বছর পায়ে হেঁটে নারায়নগন্জ গিয়েছিলাম ।

- সে তো অনেক দূর কিন্তু ফিরলেন কি করে ?

হেসে দিল মিশকাত । বললো, ফেরার পথটা অবশ্য বাসেই ফিরেছি ।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, নারায়নগঞ্জের চেয়েও দূরে হাঁটবার কোন প্ল্যান আছে ?

- আছে আর সে হলো ময়মনসিংহ । তবে রাস্তায় ক'রাত হোটেলে কাটাতে হবে ?

- আপনার বাবা-মা মত দিয়েছেন ?

- ইয়েস, বাবার কোন আপত্তি নেই, তবে শর্ত হলো প্রতি ঘন্টায় একবার মোবাইলে কথা বলতে হবে । আর যে রাস্তা দিয়ে যাব তার রোড ম্যাপ দিয়ে যেতে হবে, যেন বিপদ হলে বাবা গিয়ে নিয়ে আসতে পারে ।

আমি হেসে বললাম, তো এই অঘটনটা কবে ঘটছে ?

- সামনের মাসের বার তারিখে । তখন ইউনিভার্সিটি ছুটি, তখন হাঁটা দেব ।

আমি বললাম, এত জায়গা থাকতে ময়মনসিংহ বেছে নিলেন কেন ?

মিশকাত বলতে লাগলো, কারণ ছেলেবেলায় ময়মনসিংহে ছিলাম এক বছরের জন্য । তখন ব্রক্ষপুত্রের পাড় দিয়ে অনেক হেঁটেছি । তারপর থেকে ব্রক্ষপুত্র ভাল লাগে ।

আমি বললাম, ওখানে থাকবেন কোথায় ?

- ব্রক্ষপুত্রের পাড়ে সুন্দর হোটেল আছে । দু দিন থেকে ফিরে আসবো ।

আমি একটু থেমে বললাম, এই যে এত হাঁটেন, এতে কি কোন লাভ হচ্ছে ?

মিশকাত হেসে বললো,

আসলে লাভটা কি, সেটা খতিয়ে দেখিনি । তবে জীবনের বড় অংশ শিখেছি হাঁটতে গিয়ে । টেবিল-চেয়ারে যতখানি মাথা কাজ করে, হাঁটতে গেলে হাজার-গুণ বেশি করবে । আমার সমস্যার বেশির ভাগ সলভ করেছি হাঁটতে গিয়ে । বিশ্বেস না হয় আপনি হেঁটে দেখতে পারেন ।

আমি সাথে সাথে বলে উঠলাম,

আমি না হেঁটেই বলতে পারি আপনার কথাটা ঠিক না । আপনাকে একটা তথ্য দিতে চাই, রৌদ্রে হাঁটা কিন্তু স্বাস্থের জন্য ভাল নয় । আপনি নিশ্চয় জানেন ?

মিশকাত হেসে বললো,

রৌদ্র দেখছেন কোথায় ? এ যে আদ্র-শুষ্ক নিটোল উত্তাপ । রৌদ্রের একটা গন্ধ আছে, সে গন্ধটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ।

আমি বললাম, সেদিন যে বললেন বরফ পড়া ভালো লাগে ?

মিশকাত বললো, যার বরফ পড়া ভাল লাগে, তার রৌদ্রও ভাল লাগবে কারণ ওরা যে কাজিন ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য, তারপর বললাম, আপনাকে মিশকাত না ডেকে হাঁটা-মানুষও ডাকা যায় ।

মিশকাত হেসে দিল । বললো,

হাঁটা-মানুষ কথাটা আমার জন্য সাজে না কারণ আমি সামান্যই হাঁটি । আমার চেয়ে হাজার-গুন বেশি হাঁটেন, এরকম মানুষ অনেক আছে । ইবনে বতুতা শত শত মাইল পায়ে হেঁটেছেন এবং শুধুমাত্র শাহজালালকে দেখতে উনি সিলেট এসেছিলেন অথচ দেখেন আমরা অনেকেই সিলেট যাইনি ।

আমি চুপ করে গেলাম । মনে মনে ইবনে বতুতা নিয়ে মিশকাতের যুক্তি খন্ডন করতে চাচ্ছি কিন্তু কোন যুৎসই জবাব পাচ্ছি না এই মূহুর্তে । সত্যি তো, একটা মানুষ এত দূর থেকে সিলেট আসতে পারে আর আমরা ট্রেনে-বাসে যেতে পারি না ? কিন্তু হেরে যাব সেটাও মেনে নিতে পারলাম না ।

একটু রাগ করেই বললাম, আপনি কি তাহলে বলতে চাইছেন আমাদের উচিত সিলেট ঘুরে আসা ?

মিশকাত হেসে দিল । বললো, আমি ঠিক তা মিন করিনি । আপনি রেগে বলছেন কথাটা । উত্তরটা আপনিও জানেন ।

আমি জিদ ধরে বললাম, না, জানি না ।
মিশকাত হেসে দিল আবারও । কিছু বললো না ।

মিশকাতের হাসি দেখে রাগ এক ধাপ চড়ে গেল । কিন্তু যুৎসই কিছু না পেয়ে ভেতরে ভেতরে তাপ ছড়াতে লাগলাম কিন্তু কেন খামাকায় রেগে যাচ্ছি, সেটা ভেবে হাসি পেল ।

আমি বললাম, আপনার কিন্তু খুব মজা । রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান । আবার ঠিক ঠিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে জান অথচ আমরা কাঠ-খড় পুড়িয়েই চান্স পেয়েছি ।
মিশকাত হেসে বললো,

মজার ব্যাপার কি জানেন, আমার লাক খুব ভাল । পরীক্ষায় কেমন করে যেন ভাল করে ফেলি । তাই আজো টিকে আছি ।

আমি বললাম, এই যে এত সময় নষ্ট করে রাস্তায় হাঁটেন, আপনার বাবা-মা কিছু বলেন না ?
মা একটু মন খারাপ করেন তবে বাবা কিছুই বলেন না । সেজন্যই তো এসব করতে পারি ।
- কেন, বলেন না কেন ?
মিশকাত বলতে লাগলো,

বাবার বিশ্বাস কাউকে তার বিকাশে বাধা দিতে নেই । কে, কোন কাজ নিয়ে বড় হচ্ছে, সেটা মানুষের জানা নেই । তাই বাধা দিতে গেলে হয়তো প্রতিভার বিকাশ হলো না । যে খেলোয়ার হতে চায়, তার খেলোয়ারি হওয়া উচিত । .

মিশকাতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলাম, আর যে রাস্তায় হাঁটতে চায়, তার হাঁটাই উচিত ।
মিশকাত হেসে উঠলো । বললো, আমি জানি আপনি রেগে যাচ্ছেন । আজ চলি । এই নিন আপনার নোট । আপনার অনেক সময় নিয়ে ফেললাম ।
আমি নিজেকে সামলে বললাম, আপনার তো দেখাই হলো না । বরন্চ কাল দিয়েন । আমার তাড়া নেই ।
মিশকাত নিতে ইতস্তত করছিল । আরেকবার বলাতে হাতে তুলে নিল । বললো, আপনাকে ধন্যবাদ, এই বলে হাঁটা দিল । তারপর ফিরে এসে বললো, হলে সিট নিয়েছেন ?
- ইয়েস । সামনের সপ্তাহে উঠে যাব তবে সব সময় থাকবো না ।
- কেন, থাকবেন না কেন ?

আমি বললাম,

আমার বাবা-মা আছেন সিদ্ধেশ্বরীতে। উনারা আমাকে না দেখে থাকতে পারেন না। শুধুমাত্র যেদিন খুব ভোরে ক্লাস থাকবে অথবা গ্রুপ পাকিয়ে পড়তে বসবো, সেদিনই থাকবো।

- কোন হলে সিট নিলেন ?

- সামসুন্নাহার।

- রুম নম্বর কত? কথাটা জিঙাসা করেই ঘুরিয়ে নিল।

আমি হেসে বললাম, আমার রুম নাম্বার ২০৪ এবং সেজন্য আপনার সংকোচের কিছু নেই। ছেলেরা চাইলেও মেয়েদের হলে ঢুকতে পারবে না।

মিশকাত লজ্জা পেয়ে গেল। বললো, আমি ঠিক তা মিন করিনি। ঠিক আছে, চলি।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। দেখলাম ছেলেটে উঠে যাচ্ছে কিন্তু সেদিনের মতন আজকেও সার্টের বোতাম খোলা। আজ আর না বলে পারলাম না। বললাম, আপনাকে একটা কথা বলি ?

- বলেন।

- আপনার সার্টের বোতাম খোলা। যদি বন্ধ করতেন, তো ভাল হতো।

মিশকাত লজ্জা পেয়ে গেল। সে ভাবতে পারেনি কোন মেয়ে তাকে ব্যাপারটা ধরিয়ে দেবে।

- আপনাকে ধন্যবাদ মনে করিয়ে দেবার জন্য, এই বলে চটজলদি বোতাম লাগিয়ে হাঁটা দিল।

।।৪ ।।

পারিবারিক বেকারি

সিদ্ধেশ্বরীতে আমাদের একতলা বাড়ি । বাড়ির আশেপাশে কিছুটা জায়গা আছে । আব্বা অনেক আগে জমিটা কিনেছিলেন । তাই সিদ্ধেশ্বরীর মতন ব্যয়বহুল জায়গায় আমরা বাড়ি করতে পেরেছি । সব মিলিয়ে চারটি বেড রুম আছে । সবচেয়ে কোনার ঘরটাতে আমি থাকি । মাঝখানে আমার ছোট ভাই, বাবলু, ক্লাস সিক্সে পড়ে সিদ্ধেশ্বরীতে । এদিকের ঘরে আব্বা-মা । ওপাশে যে ঘরটা আছে, সেটা খুলে দেয়া হয় কেউ এলে ।

আমাদের বাড়ি থেকে একটু এগুলেই বড় রাস্তা । সেই রাস্তার পাশে বাবা-মার দোকান । বাবা-মা নাম দিয়েছে পারিবারিক বেকারি । পারিবারিক বেকারি এজন্য বলছি, এ দোকানের কর্মচারি বা মালিক বলতে আমরা চারজন, আমি, আব্বা, আম্মা, আর বাবলু । আমাদের চারজনের নামে বাবা পারিবারিক বেকারি খুলেছেন ।

এই পারিবারিক বেকারির বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে মাত্র একটি আইটেম বানানো হয় । তা হলো কেক । মা নাম দিয়েছে পারিবারিক কেক, যা ব্র্যান্ড হিসেবে চালু হয়েছে এলাকায় । লোকজন এসে বলে, দুটো পারিবারিক কেক দিন তো ? মা সুন্দর করে প্যাক করে দেন ।

পারিবারিক কেকের সাইজ সব সময় একি থাকে । তবে কেউ অর্ডার দিলে মা সে ভাবে বানিয়ে দেয় । এই পারিবারিক কেক মা নিজস্ব ফরমুলায় তৈরি করেছেন ।

পারিবারিক বেকারি একেবারে বড় রাস্তার উপরে। বেকারির পেছনে এক রুমের কারখানা। কারখানাটা এয়ারকন্ডিসনে মোড়ানো যেন বাইরের ধুলা-বালি না ঢুকতে পারে। ঝকঝকে, তকতকে পরিবেশে মার কেক বানানো চলে।

সকাল আটটায় বাবা-মা কারখানায় চলে যায়। তারপর শুরু হয় ওদের কেক বানানো। মাঝে-মধ্যে আমি গিয়ে সাহায্য করি। বাবলু যায় বিকেলে স্কুল করে।

এভাবে বেলা ১২ টার মধ্যে পন্চাশটির মতন কেক বানানো হয়। পারিবারিক বেকারি খোলে বেলা ১২ টার পর আর বন্ধ হয়ে সন্ধ্যে ছটায়। এই ছ'ঘন্টায় সব কেক বিক্রি হয়ে যায়। অনেক সময় লোকজন এসে ফিরে যায় কেক না পেয়ে। আব্বা-আম্মা অনেক মাফ চেয়ে দোকান বন্ধ করে ফেলে। ইচ্ছে করলে ওরা রাত-ভর দোকান খোলা রাখতে পারতো, চাইলে আরো বিক্রি বাড়ানো যেত কিন্তু ওরা তা করে না। সন্ধ্যেটা ওরা কাটাতে চায় আমাদের সাথে। সন্ধ্যের পর জমে ওঠে আমাদের পারিবারিক আসর।

মাগরিবের নামাজ পড়ে বাবা এসে বলেন, রুশা, নামাজ পড়েছিস ?

- এই তো পড়লাম।

- একটা গান ধরতো।

মা এসে পাশে বসে।

- কোন গানটা শুনবা ?

- *কবে সাধুর চরণ ধুলি মোর লাগবে গায়ে ....*

আমি হারমোনাইয়াম নিয়ে গাইতে শুরু করি।

বাবা-মা চোখ-কান বন্ধ করে শোনে। আমাদের বাসায় লালন খুব পপুলার। লালনের টানে ওরা একবার কুষ্টিয়া গিয়েছিল। সাথে আমি আর বাবলু। ওখানে তখন লালনের মেলা চলছিল। হরেক পদের গায়ক এসেছে মেলায়। একেক জন একেক রকম করে লালন গায়। সবচেয়ে ভাল লাগলো পাগলা হারুণের গলা। লোকটার গলা এত পরিস্কার, এত দরদে ভরা, আমাদের মন ভরে এলো।

মাঝে মধ্যে বাবা সিদ্বশ্বরীর মোড় থেকে ডিভিডি ক্যাছেট নিয়ে আসে । সেদিন দেখলাম ট্রাপস এনেছে । হাকডাক করে বললো, মাগরিব পড়ে তাড়াতাড়ি আসো । এখনি ট্র্যাপস ছাড়বো ।

মাঝে-মধ্যে মুড়ি-চানাচুর বানায় আমাদের মা, সাথে টমেটির কোয়া । সেটা খেতে খেতে আমদের ডিভিডি দেখা চলে ।

বাবা একদিন এসে বললো, রুশা, তাড়াতাড়ি আয় । ভাল সিনেমা এনেছি ।

- সরি বাবা, পরীক্ষা আছে । তোমরা দেখ ।

বাবা চুপ হয়ে গেলেন ।

ঠিক আছে, পড়, এই বলে বাবা চলে গেলো ।

কানে আসতে লাগলো সিনেমার ডায়লোগ । সিনেমার ফাঁকে ফাঁকে ওরা আসছে আমার ঘরে । দুই একটা কথা বলে আবার চলে যাচ্ছে । বুঝতে পারছি আমাকে রেখে শান্তি পাচ্ছে না । তখন কিছুক্ষণের জন্য হলেও ওদের পাশে গিয়ে বসি যেন স্বস্তিতে সিনেমা দেখতে পারে ।

সন্ধ্যের পর আমরা সাধারণত সিনেমা দেখি অথবা গান শুনি । তবে এগারটার মধ্যে আমরা শুয়ে পড়ি যেন ফজর ধরতে পারি । সিদ্বেশ্বরী মসজিদে পাঁচটা বিশে আজান পড়ে । আমরা উঠে নামাজ পড়ি তারপর আরো ঘন্টা দেড়েক ঘুমিয়ে নেই । মা অবশ্য ঘুমান না । অল্প ঘুমেই ফুরফুরে হয়ে যায় আমাদের মা । আমি আর বাবা পারিনা । আমাদের সাত ঘন্টা না ঘুমালেই না ।

একবার ফুপি এলো সিরাজগন্জ থেকে । বাবারা এক ভাই এক বোন, যেমন আমি আর বাবলু । ফুপির টিবি হয়েছে । ওখানে খুব একটা ভাল চিকিৎসা নেই । ফুপার অবস্থাও তেমন ভাল না । গ্রাম-গন্জে দোকান করে জীবন চালায় । আমার মা-ই ফুপিকে ডেকে আনলো ।

আগে যেমন বলা হতো, যার হয় যক্ষ্মা, তার নাই রক্ষা । এখন সে সবের বালাই নেই । ভাল চিকিৎসা পেলে রুগি দাঁড়িয়ে যায় । আমি কখনো টিবি প্যাসেন্ট দেখিনি । এই প্রথম দেখলাম ।

ফুপি বললো, তুমি কেন ডাক্তার হলা না ?

- কেন, ডাক্তার হতে বলছো কেন ?

- ডাক্তার হলে কত লোকের সেবা করতে পারতা । আমার যক্ষ্মা ভাল হয়ে যেত ।

- আমি ডাক্তার না হলেও তোমার যক্ষ্মা ভাল হবে । কদিনেই দাঁড়িয়ে যাবা ।

- তোমরা যখন আছ, তখন তাই তবে । তোমাকে একটা কথা বলি ?

- বলো ।

- তোমার মার যত্ন নিও ।

- কেন, হঠাৎ এ কথা বলছো কেন ?

ফুপি হেসে বললো, এমন ভালা মহিলা আর নাই ।

- কিভাবে বুঝলা ?

- কেউ কি ফোন করে যক্ষ্মা রোগিরে বাসায় আনে ?

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

ফুপি বলতে লাগলো, তোমাকে একটা কথা বলি ? কাউরে বলতে পাড়বা না ?

আমি ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম ।

ফুপি বলতে লাগলো,

ভাই-জানের বিয়ের সময় আমি সবচেয়ে আপত্তি করেছিলাম । খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম যেন ভাইজান শহরের মেয়ে বিয়ে না করে ।

আমি সাথে সাথে বললাম, শহরের মেয়ে বিয়ে করলে অসুবিধে কোথায় ?

ফুপি হেসে বললো, শহরের মেয়েরা ছেলেদের লুকাইয়া ফেলে ।

আমি বললাম, কদিন নাওয়া-খাওয়া বন্ধ রেখেছিলে ?

- তিন দিন । তারপর ভাইজান বিয়ে করলে তিনমাস ভাইজানের সাথে কথা বলিনি । তোমার আম্মাই আমার রাগ ভাঙান ।

আমি হেসে বললাম, এখন রাগ ভেঙেছে ?

ফুপি হাসলো, কিছু বললো না ।

আমি বললাম, তোমাকে কি একটু পানি দেব ?

- দাও ।

আমি গিয়ে পানি নিয়ে এলাম । ফুপি আগ থেকেই তার থালা-গ্লাস আলাদা করে রেখেছিল যেন রোগ-বালাই না ছড়াতে পারে । ফুপির গ্লাসে ফুপিকে পানি দিলাম ।

আমি বললাম, তোমার টিবি ধরা পড়েছে সেই কবে, এতদিন জানাওনি কেন ?
- শরম করে ভাইজানরে কিছু বলতে ।
- তোমার ভাইয়ের বাড়িতে তোমার শরম কিসের ?
- সবাই তো তোমাদের মতন না ।
আমি হেসে দিলাম । বললাম, যাও, বিশ্রাম নাও গে । বিকেল পাঁচটায় ঔষধ খেতে হবে ।
ফুপি কাঁদতে শুরু করলো ।
আমি বললাম, কাঁদছো কেন ?
- তোমরা খুব ভালা, তোমার মাও খুব ভালা, বলতে বলতে ফুপি চলে গেলো ।

ফুপিকে যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো কারণ ফুপি বাড়িতে থাকবে না কিছুতেই যেন রোগ বালাই বিস্তার না করে । আমরা পালা করে ফুপিকে দেখতে যেতাম । আমি আর আব্বা গেলে মা আর বাবলু বাসায় থাকতো । বাবলু আর মা গেলে আমরা বাসায় থাকতাম । তবে ফুপির সবচেয়ে পছন্দ পারিবারিক কেক । দুই দিন পর-পর মা পারিবারিক কেক নিয়ে যেত । খুব খুশি হতো ফুপি ।

ঝাড়া দুই মাস চললো ফুপির চিকিৎসা । সেরে উঠলো ফুপি । যাবার আগে আমার হাতে একশ টাকার নোট দিল । বললো, আমার কাছে এই টাকাটাই আছে । তুমি আর বাবলু কিনা খাইও ।

আমার হাসি পেল টাকাটা দেখে কিন্তু ফিরিয়ে দিতেও দিলাম না । হয়তো ফুপি কষ্ট পাবে ।

ফুপা এসে হাজির হলো কদিন পরেই । মুখে লম্বা দাড়ি, আপাদমস্তক আলখেল্লায় মোড়ানো । সব সময়ে টুপি পড়ে মাথায় । আব্বার চেয়ে বয়েসে বড় হবে ।

ফুপাকে অনেকদিন পরে দেখলাম । আগের চেহারার সাথে এ বেশের কোন মিল নেই । কেমন বুড়িয়ে গেছে ফুপা ।

আমাকে বললো, পশ্চিম কোন দিকে ?

আমি দেখিয়ে দিলাম ।

ফুপা নামাজে দাঁড়িয়ে গেল ।

নামাজের শেষে বললো, আমরা পরশু চলে যাব । যাবার আগে মিরপুর মাজারে যাব । হুজুরের নাম অনেক শুনেছি । কিভাবে যাব, বলো ?

আমি বললাম, কাল কলেজে যাবার পথে আপনাকে বাস-স্ট্যান্ডে নামিয়ে দেব । ওখান থেকে যেতে পারবেন ।

ফুপা মাথা নেড়ে সায় দিল । বললো, তোমরা কখনো হুজুরের মাজারে গেছ ?

আমি বললাম, না ।

- সময় পেলে যেও । অলি-আল্লাহদের মাজার অনেক বরকতের ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । কিছু বললাম না ।

।। ৫ ।।

ফুলি খালা

আম্মার দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়া, নাম ফুলি । আমি আর বাবলু ফুলি খালা বলে ডাকি । আমার চেয়ে বছর চারেক বড় হবে । ফুলি খালার ছোট বেলায় বিয়ে হয়ে যায় পাশের গ্রামের এক ছেলের সাথে । ফুলি খালাদের অবস্থা কখনই ভাল ছিল না । ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে খালা । তারপর যে বাড়িতে বিয়ে হয়, তাদের অবস্থাও নাজুক । কিন্তু মেয়ের বয়েস বাড়ছে, তাই দেরি না করে ফুলি খালার বিয়ে দেয়া হলো ।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ি দরিদ্র হলেও ওরা ফুলি খালাকে খুব ভালবাসতো । ফলে দারিদ্রতার মাঝেও ফুলি খালার মনে শান্তি ছিল । খালু চাকরি করতেন রেল কোম্পানিতে আর সেই টাকায় ওদের সংসার চলতো । কিন্তু একদিন খালু স্ট্রোক করে বসলেন, ফলে সবকিছুর দায়িত্ব ফুলি খালার উপরে এসে পড়লো ।

ফুলি খালারা তখন ঢাকার আদাবরে থাকে ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া করে । প্রতি সপ্তাহে ফুলি খালা টাঙাইল যায় শাড়ি আনতে । সেই শাড়ি সাপ্লাই দেয় ঢাকার দোকান-গুলোতে । বেশির ভাগ সাপ্লাই পড়ে গুলিস্তান মার্কেটে ।

ফুলি খালার নিজের দুই বাচ্চা, শ্বশুর-শাশুরী আর বিছানায় পড়ে থাকা স্বামী । কিন্তু এই যে এত দারিদ্রতা, এই যে এত খাটা-খাটনি, এ নিয়ে ফুলি খালাকে কখনো দুঃখ করতে দেখিনি । নীরবে নিভৃতে হাসি-মুখে কাজ করে যান আমাদের ফুলি খালা ।

ফুলি খালার ধৈর্য্য দেখে আমরা মুগ্ধ । মা চান আমরা ফুলি খালার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলি, যেন কস্টের মধ্যে কিভাবে ভাল থাকা যায়, সে শিক্ষা পেতে পারি ।

একদিন মা এসে বললেন,

ফুলির জন্য বাইরের ঘরটা ছেড়ে দিলাম যেন শাড়ি-চাদর রাখতে পারে । এখানে রাখলে বিক্রি করা সুবিধে হয় । না হলে ওকে আদাবর থেকে টানাটানি করতে হবে, তোমরা কি বলো ?
আমরা সবাই রাজি হয়ে গেলাম ।
দেখলাম একগাদা শাড়ি-চাদর বাইরের ঘরে জমা করছে ফুলি খালা ।

আমার মা আবার আমাদের সাথে আলাপ না করে কিছু করেন না । এমনকি বারান্দার টব সরাতেও আমাদেরকে জিঙাসা করে । আমরা আবার মার ইচ্ছেকেই প্রাধান্য দেই কারণ মাকে আমরা খুব ভালবাসি ।

আমি ফুলি খালাকে বললাম, এগুলো কৈ থেকে আনলে ?
- নারায়নগন্জের গ্রাম থেকে । নারায়নগন্জরে মেয়েরা খুব ভাল নকশি জানে ।
- নারায়নগন্জের ঠিক কোথায় ?
খালা বলতে লাগলেন,

শীতলক্ষ্যা পার হয়ে একটু এগুলো গ্রাম পড়বে । সকালে গিয়েছিলাম, এখন ফিরলাম । ওদের কাছে আরো আছে, চাইলে আরো আনা যাবে ।
- আবার কবে যাবা ?
- এগুলে বিক্রি হলে আবার যাব ।
- চাদরগুলো এখন কি করবা ?
- মৌচাক মার্কেটে সাপ্লাই দেবো ।
আমি হেসে বললাম, আমি পাঁচটা বেঁচে দেবো ।
খালা হেসে বললো,

তাহলে তো খুব ভাল । তোমার আম্মা বিশটা বেঁচে দেবে আর তুমি পাঁচটা । তাহলে তো সবি বিক্রি হয়ে গেল । মৌচাক মার্কেটে যাবার প্রয়োজন নেই ।

আমি বললাম, এই চাদর বিক্রি করে তোমার সংসার চলে ?

একটু চুপসে গেলেন খালা । হেসে বললো, চলে এক রকম । তোমার আজ ক্লাস নেই ?

- আছে । একটু পরে যাব ।

- এখন তো বিকেল হয়ে গেছে ?

- আমার ক্লাস বিকেলেই । কিন্তু কাল ভোরে আবার ক্লাস । আজ আর ফিরছি না, হোস্টেলে থাকবো । সকালের ক্লাস করে ফিরবো । তুমি কিভাবে ফিরবা ? থাকতো তো সেই আদাবরে ।

খালা বললো, সিদ্ধেশ্বরীর মোড় থেকে একটা বাস যায় আদাবরের দিকে ।

আমি বললাম, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে । আজ থেকে যাও । কাল ভোরে যেও ।

খালা মাথা নেড়ে ললো, আজ যাই, তোমার খালুর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না । তাছাড়া বাচ্চাদের সকুল আছে ।

আমি কিছু বললাম না । ব্যাগ থেকে চকলেট বের করে দিলাম । বললাম, তোমার বাচ্চাদের দিও । নিউমার্কেট থেকে কিনেছি ।

খালা খুশি হয়ে গেলেন ।

মা এসে বললো, রুশা, খেতে আস । ফুলি, তুমিও আস । সবাই বসে চা-বিস্কুট খাই । তোর ক্লাস কখন ?

- এখনি, আমি চলি ।

- একটু চা খেয়ে যা ।

- আচ্ছা দাও ।

প্রতি বছর আমরা পারিবারিক ভাবে একটা ভ্রমণে যাই । হোটেল ভাড়া করে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে আসি ঢাকার বাইরে । কিছু টাকাও খরচ হয় এতে ।

একদিন মা এসে বললো, তোমাদের একটা প্রস্তাব দেই ।

আমরা বললাম, বলো ।

মা বলতে লাগলেন, এ বছরের ভ্রমণটা আমরা নাইবা গেলাম । এ টাকাটা আমরা ফুলিকে দেই যেন ব্যবসাটা বড় করতে পারে, কি বলো ?

এ বছর আমাদের সিলেট যাবার কথা ছিল । স্থান-কাল-পাত্র সব ঠিক হয়ে ছিল কিন্তু হঠাৎ এমন প্রস্তাবে আমরা চুপসে গেলাম ।

আমরা চুপ হয়ে আছি দেখে মা হেসে বললেন, কি ব্যাপার, তোমরা চুপ হয়ে গেলা ? আমি তো ঠাট্টা করেছি, এই বলে হো-হো করে হেসে উঠলেন আমাদের মা । বললেন, এই বাবলু, কোন হোটেলে যেন উঠছি আমরা ?

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, আমরা যাব না এবছর । তুমি টাকাটা ফুলি খালাকে দাও ।

।। ৬ ।।

সাভার বাজার

বাসে উঠেছি আমি আর ফুলি খালা । গন্তব্য সাভার বাজার । ঢাকা থেকে গাড়ি হাঁকলে দুই ঘন্টায় পৌঁছানো যায় । সাভার বাজার থেকে একটু এগুলেই জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি । আমরা অবশ্য ওতদূর যাব না । সাভার বাজারেই নেমে পড়বো ।

এখানকার এক বাড়ি থেকে আমরা কাথা সেলাই নেবো । এক বিধবা মহিলা থাকে এখানে । সুন্দর করে কাথা বুনে । ওর কাছ থেকে ফুলি খালা কাথা নেয় । ফুলি খালা অবশ্য একাকি শাড়ি-কাথা সংগ্রহ করে না । ওদের আছে পাঁচ-ছজনের বিরাট দল । একসাথে ওরা কাথা-শাড়ি সংগ্রহ করে যেন একসাথে যে কোন হামলা মোকাবেলা করতে পারে । আজও ফুলি খালার দল আছে । আমরা সামনের সিটে বসেছি । ওরা বসেছে পেছনে ।

ফুলি খালা বললো, আজ তোমার ক্লাস নেই ?
- না, তাই তো তোমার পিছু নিলাম । দেখি তুমি কি করো ?
খালা হেসে দিলেন । কিছু বললেন না ।
আমি বললাম, আজ কতগুলো নেবে ?
- এই ব্যাগে যে কটা হয় । তুমি থাকাতে একটু বেশিই নেবো ।
খালু কেমন আছে এ বেলা ?
- আছে এক রকম । তবে সুবিধে হলো বাথরুম একাই করতে পারে । তা না হলে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেত ।
আমি কিছুক্ষণ পরে বললাম, খালু কি ভাল হবে না ?

একটু থেমে ফুলি খালা বললো,

সম্ভবত না । এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই । তবে তোমার খালু যে বেঁচে আছে, সেটাই বড় কথা । অন্তত বাসায় গিয়ে ওর সাথে কথা বলতে পারি ।

আমি হেসে বললাম, তাতেই তোমার প্রাণ জুড়িয়ে যায় ?

ফুলি খালা হেসে দিলেন । কিছু বললেন না ।

আমি বললাম, আচ্ছা, খালুর সাথে তুমি কি কথা বলো ?

- বিয়ে করো, সব জানতে পারবে ।

আমি বললাম, বিয়ের আগেই জানতে চাচ্ছি ।

ফুলি খালা বলতে লাগলেন,

সারাদিন কাজ করে বাসায় ফিরি । ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায় আমার । আমি ফিরলে ও বলে, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও । সারাদিন তো খাওয়া হয়নি । আমি ওর কথা শুনি না । জোড় করে ওর পাশে বসে থাকি । ও বার বার তাড়া দেয়, আমি যাই না ।

তাকিয়ে দেখি খালা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে । ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত এক তেইশ বছরের মেয়ের জন্য খোদা আর যাই করুক, এই সুখ টুকুন অবশিষ্ঠ রেখেছেন ।

আমি বললাম, তারপর ?

ফুলি খালা বলতে থাকে, ও তখন সারাদিনের গল্প শুনতে চায় । আমি বিড় বিড় করে সব বলি । ওকে বলা শেষ না করে আমি শান্তি পাই না ।

- আর তখনি তুমি সব শক্তি ফিরে পাও ?

খালা মাথা নাড়লেন । বললেন,

তোমার মন ভাল, আল্লাহ তোমার কথা শুনবে । তুমি দোয়া করো তোমার খালুকে যেন আল্লাহ উঠিয়ে না নেন । একটা পঙ্গু লোক পড়ে আছে, পড়েই থাকুক । ওকে উঠিয়ে নিয়ে তো খোদার কোন লাভ নেই ?

চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম দুই ধারে খাল-বিল । কৃষকরা মাথায় ক্যাপ পড়ে মাঠে নেমেছে । দূরে, অনেক দুরে একটা চিমনি থেকে ধোয়া উঠছে । বুঝলাম ওটা ইটের ভাটা । কয়েকটা নৌকা দাড়িয়ে আছে ইট ভাটার পাশে ।

আমি বললাম, তোমার লেখাপড়াটা বন্ধ হয়ে গেল । তোমার আফসোস হয় না ?

- কেন ?

- এই যে পড়তে পারলা না ?

ফুলি খালা হেসে বললেন,

মাঝে মাঝে হয়, তবে আফসোস করে কি লাভ ? আমি চাইলেও তো অবস্থা ঘোড়াতে পারছি না । তারচেয়ে এখন যা আছে, তা নিয়েই ভাল থাকি, কি বলো ?

আমি বললাম, আমি হলে কিন্তু কান্নাকাটি শুরু করে দিতাম ।

খালা হেসে দিলেন ।

আমি বললাম, তোমাকে একটা প্রস্তাব দেই ?

- দাও ।

- আমার যেদিন ক্লাস থাকবে না, সেদিন তোমার সাথে যাব, যেন অনেক বেশি শাড়ি-চাদর নিয়ে আনতে পার । কি বলো ?

খালা খুশি হয়ে গেলেন । বললেন, তাহলে তো খুব ভাল হয় ।

- বুধবার আমার ক্লাস থাকে না । আমি তোমার সাথে যাব ।

- কিন্তু তোমার পড়াশোনা ?

- তোমাকে সাহায্য করাও তো একটা পড়াশোনা ।

খালা হেসে দিলো । তারপর বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগলেন । বুঝলাম খালা আমার জন্য দোয়া করছে ।

বিকেলে সোমা ফোন করলো ।

- তোদের সাভার এক্সপেডিশন কেমন হলো ? কটা কাথা আনলি ?

- ত্রিশটার মতন ।

- আমাকে পাঁচটা দিস, বেঁচে দেবো । কাল নিয়ে আসিস ক্যাম্পাসে ।

- ঠিক আছে ।

- এর পরের বার তোরা কোথায় যাচ্ছিস ?

- টাঙাইলে । ওখান থেকে তাতের শাড়ি আনবো ।

সোমা বললো,

আমি বাবাকে বলে গাড়ি ম্যানেজ করবো তারপর গাড়ি ভর্তি করে নিয়ে আসবো । তুই আগে কখনো টাঙাইল গিয়েছিস ?

- ইয়েস, অনেক আগে । ওখানে মার বান্ধবি থাকে ।

সোমা বললো, তোর আজ রাতে প্ল্যান কি ?

- কোন প্ল্যান নেই । সন্ধ্যের পর ভাত খেয়ে ঘুম দেবো ।

- কেন, আজ সিনেমা চলবে না বাসায় ?

- হয়তো চলবে, আমি জয়েন করবো না । বাবাকে দেখলাম কি একটা ফিল্ম এনেছে । ফিল্মের ঘটনা এরি মধ্যে জানা হয়ে গেছে ।

- তাহলে আজ বাবলু সঙ্গ দিচ্ছে ওদের ।

- ইয়েস, তবে সমস্যা হলো ওরা ফিল্ম দেখতে বসলে আমাকে কোন না কোন ভাবে নিয়ে যায় । আমাকে ছাড়া ফিল্ম দেখে শান্তি পায় না ।

সোমা বলতে লাগলো,

আমার এদিকে অবশ্য অন্য হাওয়া । আব্বা ফিরতে ফিরতে রাত । ওদিকে মার রেগুলার রুটিন সন্ধ্যের পর একটু ঘুমিয়ে নেয়া । তারপর আব্বা এলে ওরা খেতে বসে । গভীর রাতে আমাদের খাওয়া-দাওয়া চলে । ওদের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে আমার রাত জাগতে হয় ।

- তাহলে তোরা ঘুমাস কটায় ?

- একটার আগে বাসায় বাতি নিভে না । যাই হোক, তোর আমেরিকার পাত্রের খবর কি ?

- কার কথা বলছিস ?

- রুমি ভাই ।

- রুমি ভাই পাত্র হতে যাব কেন ? ও তো মার বন্ধুর ছেলে ।

- ঐ হলো । বল, রুমি ভাই কেমন আছে ।

- ওরা ভাল আছে ।

- আর রুমি ভাই ?

- সেও ভাল থাকবার কথা । এত খুটিয়ে খুটিয়ে জানতে চাস কেন ?

সোমা হেসে বললো, এটা আমার স্বভাব । খুটিয়ে খুটয়ে না জানলে ভাল লাগে না । বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হয়েছে ?

- বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হবে কেন ? আমার সাথে কি রুমির বিয়ে হবে যে দিন-তারিখ ঠিক হবে ?

সোমা হেসে বললো, এত ভাল ছেলে, আমেরিকার ইন্জিনিয়ার । আমি তো কোন অসুবিধে দেখছি না ।

- ঠিক আছে তুই বিয়ে কর, আমি রাগ করে বললাম ।

সোমা হেসে দিল । বললো, তোর মানুষকে আমি বিয়ে করবো কেন ?

।। ৭ ।।

রুমি

আমার মার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী রোকেয়া খালা । আম্মা আর রোকেয়া খালা এক সাথে ইডেনে পড়েছে । সেখান থেকে ওদের খাতির । তবে ব্যাচেলার করবার আগেই রোকেয়া খালার বিয়ে হয়ে যায় আমেরিকার এক ছেলের সাথে । সেই থেকে খালা আমেরিকায় । তবে রোকেয়া খালা আমেরিকাতেই থাকুক, আর বাংলাদেশেই থাকুক, মার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ আছে । সপ্তাহে দুই-একবার ওদের ফোনে কথা হয় । মা না করলে রোকেয়া খালা, অথবা রোকেয়া খালা না করলে মা ফোন করে ।

রোকেয়া খালার সাথে মার হৃদ্যতার প্রধান কারণ ওদের স্বভাবের মিল । মার যা যা পছন্দ, রোকেয়া খালারও তাই । সেই সূত্র ধরে ওরা ঠিক করেছে ওদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হবে ।

রোকেয়া খালার দুই ছেলে । বড় ছেলে রুমি । ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ইন্জিনিয়ারিং পড়ে । এ বছর বেরিয়ে যাবে । খালার ইচ্ছে রুমির সাথে আমার বিয়ে হোক আর এ প্রস্তাবে আমার মা-জননী শতভাগ রাজি । আব্বারও মত আছে । ওরা নিজেরা বিয়ে ঠিক করে রেখেছে আমাদের সাথে আলাপ না করেই ।

একদিন মা ডাকলেন ।

- রুশা ।

আমি বললাম, আসছি ।

বসার ঘরে ঢুকে দেখি মা বসে আছে, ওপাশে একটা ছেলে । দেখতে খুব সুন্দর । পরিস্কার করে দাড়ি-গোফ কামানো ।

মা বললেন, এ রুমি । তোর রোকেয়া খালার ছেলে । দেশে এসেছে কদিনের জন্য ।

রুমি দাঁড়িয়ে হেসে দিল । বললো, কেমন আছেন ?

আমি কেমন থতমত খেয়ে গেছি ।

বললাম, ভাল । আপনি ?

- আমিও ভাল, বলে হেসে দিল রুমি ।

আমি খেয়াল করে দেখলাম, হাসতে গিয়ে ছেলেটার মুখে টোল পড়েছে । মেয়েদের টল পড়লে ভালই লাগে কিন্তু ছেলেদের বোকা বোকা লাগে । আমার খুব হাসি পেল কিন্তু হাসলাম না ।

মা বললেন, তোরা গল্প কর । আমি ভেতর থেকে আসছি ।

যাবার সময় বললো, তুমি কিন্তু আমাদের সাথে ডিনার করে যাবা ।

রুমি কিছু বললো না । মাথা নেড়ে সায় দিল ।

আমি বললাম, বসুন ।

আমরা বসে পড়লাম ।

রুমি বললো, আপনার পড়াশোনা কেমন চলছে ?

- এই তো । আপনার ?

- আমার পড়া প্রায় শেষ, এক সেমিস্টার আছে । তারপর বেরিয়ে যাব ।

- আর পড়বেন না ?

- না । আপাতত চাকরি করবো । মাস্টার্স করলেও পরে ।

আমি বললাম, আপনি কবে এসেছেন দেশে ? মা তো কিছু বলেনি ?

রুমি হেসে বললো,

মা ইচ্ছে করে খালাকে কিছু বলেনি সারপ্রাইজ দেবার জন্য । আমি এক সপ্তাহ আগে এসেছি । মা আসবেন আগামী সপ্তাহে ।

- কতদিন থাকবেন এবার ?

- এক মাসের মতন ।

- এর আগে কখনো ঢাকা এসেছিলেন ?

- ইয়েস । কয়েকবার আসা পড়ছে । তবে এখনকার ঢাকা অন্য রকম । মানুষে মানুষে ঠাসা ।

আমি বললাম, কেমন লাগছে এত মানুষ দেখে ?

- ভালই তো । আমার সবচেয়ে ভাল লাগে মানুষ ডিঙিয়ে ফুটপাত দিয়ে হাঁটা ।

- কোথায় কোথায় গেলেন ?

- যখনি সুযোগ পাচ্ছি, ঘুরে দেখছি । পুরোনো ঢাকাতে গিয়েছি গতকাল । শাখারি পট্টি দেখে এসেছি । শাখারি পট্টি না দেখলে বড় কিছু দেখা হতো না ।

- কেন, তা বলছেন কেন ?

রুমি বললো, মানুষ যে এত গায়ে-গায়ে বাস করতে পারে, সেটা ভাবাই যায় না । আমি আবার যাব ।

- কেন, আবার যাবেন কেন ?

- ওরা গায়ে-গায়ে বাস করলেও ওদের আন্তরিকতা আছে । সেটা দেখতেই যাব । আপনি যাবেন আমার সাথে ?

আমি হেসে বললাম, না, ঠিক আছে । এবার আপনি দেখে আসুন ।

আমি গিয়ে দেখি রান্না ঘরে বিরাট আয়োজন । বাবাকে দিয়ে বাজার করানো হয়েছে । পোলাও-কোরমার তোরজোড় চলছে ।

মা বললেন,

তোর এখানে আসার দরকার নেই । আমি এদিকটা দেখছি । তুই রুমির সাথে কথা বল । ছেলেটা বসে আছে একা একা ।

আমি বললাম, বাবাকে পাঠাও না ?

- তোর বাবাকে পাঠিয়েছি দই-মিস্টি আনতে ।

আমি কিছু বললাম না । বসার ঘরের দিকে হাঁটা দিলাম ।

এক মাস পরে রুমিরা আমেরিকা চলে গেল । রোকেয়া খালা আমার জন্য অনেক গিফট এনেছে । ঢাকার বাজার থেকেও অনেক কিছু কিনেছে ওরা । যাবার আগে আমাকে জড়িয়ে ধরলো ।

রোকেয়া খালা মাকে বললো, তোর মেয়ে তো দারুণ লক্ষ্মী হয়েছে । কবে মেয়ে দিচ্ছিস ?

মা বললো,

ও তো কেবল ইউনিভার্সিটিতে । পাশ করতে আরো বছর তিনেক, তারপর বলিস । মেয়ে রাজি থাকলে কোন আসুবিধে দেখছি না ।

খালা বললো, কথা যেন ঠিক থাকে । পরে কিন্তু বলবি না, এসব আমি বলিনি ।

মা হেসে দিল । কিছু বললো না ।

রুমির সাথে অবশ্য আমার কোন যোগাযোগ নেই । তবে ছেলেটা আমার জন্মদিনে কার্ড পাঠায় । দু-এক লাইন লেখে । মাঝে-মধ্যে দেখি মার সাথে ফোনে কথা বলছে । তবে আমার জন্মদিনে আমাকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানায় । এ ছাড়া কখনো আমার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেনি ।

একদিন মা এসে বললো, রুমিকে তোর কেমন লাগে ?

- ভাল ।

- কেমন ভাল ?

আমি বললাম, বেশ ভাল ।

- আমি কিন্তু আমার বন্ধুকে কথা দিয়েছি ।

আমি বললাম, তুমি বন্ধুকে কথা দিয়েছো, সেটা তোমার ব্যাপার । আমাকে জড়াচ্ছ কেন ?

- তোকে নিয়েই তো ব্যাপারটা, তাই জড়াচ্ছি ।

আমি বললাম,

দেখ, আমি মাস্টার ডিগ্রি না করে কিছুই করবো না । তুমি সাবধানে কথা বলবা তোমার বন্ধুর সাথে । আর একটা কথা, আমি কাকে বিয়ে করবো, সেটা আমার ব্যাপার । এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না ।

মা হেসে বললেন, তুই রেগে যাচ্ছিস কেন ?

- রাগবার কথা বললে রাগবো না ?

মা বললেন, তোর অমতে আমরা কিছুই করবো না ।

- তাহলে রাগাচ্ছ কেন ?

একটু মজা করলাম, এই বলে মা হেসে দিলেন । বললেন,

তুই যদি রাজি থাকিস, তবেই এ বিয়ে হবে । তবে ওরা চাইছে বিয়েটা এখনি সেরা ফেলতে । বাকী পড়াটা আমেরিকায় গিয়ে করলি ?

আমি রাগতে নিয়ে রাগলাম না । চুপ করে বসে রইলাম ।

।। ৮ ।।

বাড়ি ফেরা

ক্লাস শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ । সোমার সাথে কথা হলো । দেখলাম ওর বাবা এসেছে ওকে নিতে । ও চলে গেলো ।

যাবার সময় গাড়ির জানালা দিয়ে হাঁক ছাড়লো, রাতে ফোন দিস ।

আমি মাথা নাড়লাম ।

রোকেয়া হলের সামনে এসে রিকসা নেবার চেষ্টা করছি কিন্তু কেউ যাবে না কারণ সিদ্ধেশ্বরীতে জ্যাম লেগেছে । সিদ্ধেশ্বরীর কথা শুনলেই ওরা চুপসে যাচ্ছে অথচ বাড়ি ফেরা দরকার । সিদ্ধেশ্বরী পর্যন্ত হেঁটে যাব, সেটাও সম্ভব নয় । তারচেয়ে বরন্চ লাইব্রেরীতে গিয়ে একটু বসি । যেমনি মনে হওয়া, তেমনি লাইব্রেরীর দিকে হাঁটা দিয়েছি ।

লাইব্রেরীর সামনে আসতে দেখলাম উচু কলাগাছের মতন মাথা উচিয়ে মিশকাত আসছে । আমাকে দেখে বললো, বাড়ি যাননি ?

- কিভাবে যাব ? একটি রিকসাও যাবে না ।

- তাহলে হাঁটা দিন । দেখবেন ঠিক ঠিক পৌছে গেছেন ।

আমি বললাম, সিদ্ধেশ্বরী তো আজকের কথা না । অতদূর হাঁটতে পারবো না ।

- একটু সাহস করে হাঁটা দিন । দেখবেন ঠিক ঠিক পৌছে গেছেন ।

আমি ঝাঝিয়ে বলে উঠলাম, এসব কথা প্লিজ আমাকে বলবেন না ।

মিশকাত বলে উঠলো, আমি না হয় আপনার সাথে গেলাম ?

হঠাৎ কি হলো, বুঝলাম না । সম্ভবত রাগ থেকেই বলে ফেললাম, ঠিক আছে, চলুন ।

মিশকাতি প্ল্যানটা ঠিক করলো । প্রথমে আমরা সরওয়ার্দি উদ্দ্যান পাড়ি দেব । তারপর কাকরাইল মসদিজদকে বাঁয়ে রেখে সিদ্ধেশ্বরীতে ঢুকবো ।

সরওয়ার্দি উদ্দ্যানের ভেতর দিয়ে হাঁটা দিয়েছি । ঘড়িতে দেখলাম বিকেল পাঁচটা । বিকেলের হাওয়া উদ্যানকে নাড়িয়ে দিচ্ছে । একটু হাঁটতেই বুঝলাম, এই হাটার সিদ্ধান্তটা একেবারে ঠিক হয়নি কিন্তু যেহেতু প্ল্যানটা করে ফেলেছি, পিছিয়ে আসাটা পছন্দ হলো না আমার ।

মিশকাত বলে উঠলো, বিকেলে হাঁটার মজাই আলাদা । সূয্যি মামাকে ঘাড়ের পেছনে ফেলে হাঁটা যায় ।
- আর দুপরে ?
- দুপরে উনি মাথায় চড়ে বসেন, তারপরেও ওর একটা মিষ্টি গন্ধ আছে ।
আমি বললাম, সেটা কি রকম ?
- আপনি যদি বিকেলে হাঁটেন, এক রকম গন্ধ পাবেন । দুপুরে আরেক রকম, সকালে সম্পুর্ণ আলাদা।
আমি একটু থেমে বললাম, আপনাকে একটা কথা বলি ?
- বলেন ।
- আপনি যে বললেন, তিন বেলার গন্ধ তিন রকম । আসলে এ রকম কিছু নেই । এটা আপনার কল্পনা ।
- কেন, কল্পনা বলছেন কেন ?
- কল্পনা বলছি এজন্য, আমি তিন বেলাতেই হেঁটেছি কিন্তু কখনো তিন রকম গন্ধ পাইনি ।
মিশকাত হেসে দিল । তারপর তার কথার পক্ষে যুক্তি দেখাতে লাগলো । অনেক কথা বললো ছেলেটা । আমি উত্তর দিচ্ছি না কারণ উত্তর দিতে গেলে ও হাজারটা উত্তর দেবে । এর চেয়ে চুপ থাকাই ভাল ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে সরোওয়ার্দি উদ্যান পেরিয়ে রমনা পার্কে ঢুকেছি । রমনার গেট পেরোতেই আছরের আজান পড়লো । কাকরাইল মসজিদ থেকে আজান ভেসে আসছে ।

ঘড়িতে দেখলাম বিকেল পাঁচটা ।

মিশকাত বললো, ঘড়ি দেখছেন কেন ? কোন এ্যাপায়ন্টমেন্ট আছে ?

- না । আছরের নামাজ পড়তে কত দেরি হবে, তার একটা হিসেব করবার চেষ্টা করছি কারণ এখনো তো অনেকটা পথ বাকি ।

মিশকাত বললো, নামাজ ধরতে পারবেন কারণ আমরা তো চলে এসেছি । আপনি মনে হয় অনেক নামাজ পড়েন ?

আমি বললাম,

সবচেয়ে বেশি পড়েন আমার মা । ঘড়ির কাটা ধরে নামাজ পড়েন । যেমন, মা কোথাও গেছেন কিন্তু নামাজের সময় হয়েছে । একটা কাপড় বিছিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে ।

- আর আপনার বাবা ?

আমি হেসে বললাম,

বাবা তার উল্টো । ওর নামাজ পড়বার কোন ঠিক নেই । হয়তো জোহরের নামাজ, আছরের সময় পড়লো । অথবা জোহর আর আছর এক সাথে পড়লো । তবে মার হাকডাকে বাবা এখন অনেক পানকচুয়াল ।

মিশকাত কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

আমি বললাম, আপনি নামাজ পড়েন না ?

- হ্যাঁ পড়ি । তবে আপনার মতন অত নিখুত ভাবে পড়তে পারি না ।

আমি বললাম, আপনি মনে হয় খুব বাহাদুরীর সাথে বললেন কথাটা ? আজকাল তো অনেকে বলতে ভয় পায় যে সে নামাজ পড়ে ।

মিশকাত হেসে বললো,

সরি, আমার কথায় বাহাদুরী থাকলে আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি । আসলে খোদাকে ডাকবার মতন ভাল কাজ আর একটিও হতে পারে না । তবে আমার অলসতার জন্য নামাজের টাইম-টেবিল ঠিক থাকে না ।

- কিন্তু মাইলের পর মাইল হাঁটতে তো অলসতায় পড়েন না ?

মিশকাতে হেসে দিল । বললো, আপনার কথাটাই ঠিক । আপনার বাবার সাথে আমার নাম লেখাতে পারেন ।

মিশকাতের কথা শেষ হতে আমি বললাম, খোদা নিয়ে আপনার ধারণা কি ?

মিশকাত চুপ হয়ে গেল কিছুক্ষনের জন্য । বললো, খুদা হলো লম্বা-শুকনো হাসিখুশি একজন মানুষ, যিনি নিরন্তর ক্ষমা করেন ।

আমি সাথে সাথে বললাম, উনি লম্বা-শুকনো হতে যাবেন কেন ?

মিশকাত বলে উঠলো, আমার কাছে যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি ।

- কিন্তু লম্বা-শুকনো মনে হবে কেন ?

মিশকাত বলতে লাগলো,

লম্বা-শুকনো কথাটা রুপক অর্থে বলেছি । আসলে খোদার কোন আকার নেই । লম্বা-শুকনো এজন্য বলছি কারণ লম্বা-শুকনো ব্যাপারটার মধ্যে একটা স্বস্তির ব্যাপার আছে । যেমন, লম্বা-শুকনো একটা মানুষ দেখলে আমাদের স্বস্তি লাগে । মনে হয় লোকটা খুব স্ট্যাবল । যেহেতু খোদা সবচেয়ে স্বস্তিকর জায়গা, তাই লম্বা-শুকনো মনে হয় ।

আমি বললাম, আপনি মনে হয় খোদাকে ভয় পান না একদমি ?

- আসলেই খোদাকে ভয় পাই না ।

- কেন, কারণটা জানতে পারি ?

মিশকাত বলতে লাগলো,

কিভাবে ভয় পাই বলুন ? যিনি সকল ঙানের আধার, যিনি সকল প্রাণের প্রেরণা, যিনি সকল করুণার প্রতিচ্ছবি, তাকে ভয় পাওয়ার কি কোন কারণ আছে ?

আমি বললাম,

আপনি ভয় না পেলেও আমি পাই । আমরা অপরাধ করলে উনি কঠোর সাজা দেবেন ।

মিশকাত চুপ হয়ে গেল কিছুক্ষনের জন্য । বললো,

এমন অনেক তারকা আছে, যার আলোক-রশ্মি এখনো এসে পৌছায়নি । বুঝতেই পারছেন কত ব্যাপক এই বিশ্বব্রমান্ড । যিনি এইটে বানিয়েছেন, তার মনের প্রসারতা কত গভীর, একটু আন্দাজ করুন ? আসীম মনের এই পরম-মানুষটি আমাদের কেটে-কুটে সাবার করে দেবেন, সেটা কখনোই মানতে পারবো না । খোদার ক্রোধ আছে, রাগ আছে কিন্তু তার দিল তার ক্রোধকে ছাড়িয়ে গেছে ।

মনে মনে ভাবছি মিশকাতের কথা । এমন একটা যুৎসই জবাব খুজছি যেন ছেলেটা চুপসে যায় কিন্তু এই মূহুর্তে কিছু পাচ্ছি না । কথা ঘুরিয়ে বললাম, আর যে বললেন, খোদা সব ক্ষমা করেন, সেটার মানে কি?

- মানুষ নিরন্তর পাপ করবে, এটাই স্বাভাবিক কারণ পাপ করবার ব্যাপারটা তার সত্বার মধ্যে দেয়া আছ । খোদার কাজ হলো সে সব ক্ষমা করে দেয়া ।

- কিভাবে বুঝলেন উনি সব ক্ষমা করেন ?

মিশকাত মাথা ঝুকিয়ে বললো,

উত্তরটা খুব সহজ । উনি যদি ক্ষমা নাই করতেন, মনুষ্য জাতি তার অপকর্মের জন্য অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে যেত । আমার আর আপনার আজকের বৈকেলিক হাঁটা হতো না ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, আপনাকে একটা কথা বলি ? ঠিক ঠিক জবাব দেবেন ?

- ইয়েস দেবো ।

- এসব আজে-বাজে তত্ব আপনি কি রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বের করেন ?

মিশকাত রাগ করলো না বরং হেসে বললো,

রাস্তায় হেঁটেই বের করি আর বাড়িতে বসে বের করি, আমার কথাগুলো ভেবে দেখবেন । ভুল হলে বলবেন এবং কোথায় কোথায় ভুল হলো, ধরিয়ে দেবেন ।

আমি সাথে সাথে বললাম,

এসব আমি ভাবি না, ভাবতেও চাই না । কারো ভুল ধরিয়ে দেয়াটা আমার কাজ না । আমাকে ক্ষমা করবেন ।

দেখতে দেখতে আমরা রমনা রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছি । ওদিকে দেখলাম রমনা-লেকে লোকজন নৌকায় ঘুরছে । একজন বাদাময়ালা পাশ দিয়ে চলে গেল । দেখলাম পায়ে ব্যথা শুরু হয়েছে ।

আমি বললাম, চলুন, রমনা-রেস্তোরাতে একটু বসি ।

- চলুন, এই বলে মিশকাত আমার পিছু পিছু হাঁটা দিল ।

রমনা-রেস্তরার ঝুলন্ত বারান্দায় আমরা বসেছি । এই বারান্দার নিচে কুল-কুল শব্দে লেক গড়িয়ে চলেছে । আমাদের আশেপাশে অনেকেই বসে আছে ।

- চা দিতে বলি ? আমি বললাম ।

- না, আমি চা খাই না । শুধু ঠান্ডা পানি খেতে পারি ।

দেখতে দেখতে ঠান্ডা পানি আর চা এলো, সাথে বোড়া ভাজা । চা খেতে খেতে বললাম, আর কতক্ষণ লাগবে বাড়ি পৌছতে ?

- চল্লিশ মিনিটের মতন কারণ আপনি তো বলছেন আপনার বাড়ি মহিলা সমিতির পেছনে ।

আমি মাথা নাড়লাম । বললাম, বলুন আপনার রাশিয়ার কথা । রাশিয়ার কি কি বই পড়লেন ?

মিশকাত আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললো, রুশ-সাহিত্য পড়তে চান ? বাবার লাইব্রেরি থেকে ধার আনতে পারি ।

আমি বললাম, এখন আর পড়ি না । দেখেন না হাফিজ স্যার এক গাদা পড়া দিয়েছেন । শুনছি পরীক্ষার ডেটও পরবে ।

মিশকাত বললো, আমি সবচেয়ে ভয় পাই পরীক্ষা আর সেটাই ঘাড়ে চাপছে । পলানো ছাড়া উপায় কি ?

- সত্যি সত্যি পালাবেন নাকি ?

- সেরকম কোন প্ল্যান নেই অন্তত এই বয়েসে । তবে স্কুল ফাইনালে একবার পালাতে চেয়েছিলাম ।

- সেটা কি রকম ?

মিশকাত বলতে লাগলো,

পরীক্ষার দিন ঠিক করলাম পালাবো । একটা পোটলাও বেঁধে ফেললাম কিন্তু গোল পাকালো আমার ছোট-ভাই । ও কি করে যেন বুঝে ফেলেছে । তখনি বাবা-মা এসে ধরে ফেললেন । পালানো হলো না ।

আমি হেসে বললাম,

তখন তো ছেলে-ছোকরা ছিলেন । ধরে রাখবার লোক ছিল । এখন সে সুযোগ নেই । নিজের জীবন নিজেকেই সাজাতে হবে ।

মিশকাত মাথা নেড়ে সায় দিল। বললো, ছাত্র জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিক কি জানেন ?

- কি ?

- সেটা হলো পরীক্ষা। পরীক্ষা না দিয়ে যদি ছাত্র-জীবন পার করা যেত তো খুব ভাল হতো।

আমি বললাম, আপনাকে একটা কথা বলি ?

- বলেন।

- বাসায় গিয়ে পড়তে বসেন। স্যার যা যা পড়াচ্ছেন, সেগুলো পড়বার চেষ্টা করেন। দেখবেন আপনার ভাল ছাড়া মন্দ হবে না।

মিশকাত মাথা নাড়লো। বললো, কেমন লাগছে ক্লাস ?

- ভাল। খুব ভাল। হাফিজ স্যার সবচেয়ে ভাল। ভদ্রলোক জানেনও অনেক। কিন্তু রেগে গেলে খবর আছে। আমার আত্মা শুকিয়ে যায়।

- আমারও তাই, বলে মিশকাত হেসে দিল।

।। ৯ ।।

আহা আজি এ বসন্তে

আজ দুদিন হলো জামালপুর এসেছি মামার বাড়িতে । মামাকে দেখবো আর নববর্ষ পালন করবো এই আধা-পল্লী, আধা-শহরে । বাবা গেছে চিটাগাংয়ে তিন দিনের জন্য, তাই আমাদের সাথে নববর্ষ করা হলো না । সম্ভবত এবারি বাবা বাদ পড়লো অনুষ্ঠান থেকে ।

মামা বিসিএস দিয়ে সরকারি কলেজে ঢুকেছে । ওর পোস্টিং হয়েছে জামালপুরে । কলেজের পাশেই বাড়ি নিয়েছে মামা । এখান থেকে হেঁটে যাওয়া যায় । আমার সাথে মা আর বাবলু এসেছে । আমরা তিন-চারদিন থাকবো মামার সাথে ।

আমি মামাকে বললাম, কেমন লাগছে তোমার ?

- দারুণ । আসলেই দারুণ ।

আমি বললাম, প্রথম প্রথম দারুণ লাগবে, তারপর ভাল লাগবে না ।

- কেন, সে কথা বলছিস কেন ?

আমি হেসে বললাম,

এ জন্য বলছি, তোমার জীবন কেটেছে শহরে । হঠাৎ এই আধা-পল্লী, আধা-শহরে এ্যাডজাস্ট করতে পারবে না ।

মামা অনেকক্ষণ চুপ মেরে গেল । বললো,

বাংলাদেশের সমস্যা একটাই । যা কিছু সব ঢাকায় । ঢাকা থেকে বেরুলে আর খবর নাই ।

আমি বললাম, তবে তোমার সমস্যা একটু কম হবে ।

- কেন, কম হবে কেন ?

- কারণ তুমি আউলা । আউলাদের সমস্যা একটু কমিই হয় । ওরা যে কোন জায়গায় এ্যাডজাস্ট করতে পারে ।

মামা বলে উঠলেন, আমাকে কেউ আউলা বলে না । শুধু তুই বলিস ।

- তোমাকে তো আউলা বলার কারণ নেই কারণ তোমার বন্ধুরাও আউলা । এক আউলা আরেক আউলাকে চিনবে কি করে ? যাই হোক, ক্ষিদে লেগেছে । চলো খেতে যাই ।

আমরা খেতে বসেছি । মা বসেছে সবার মাঝে । এদিকে আমি, ওদিকে বাবলু । জানালা দিয়ে ধুধু-ক্ষেত আর বাধানো ঘাট চোখে পড়লো । রাস্তার ওপারে শহুরে ভাব আছে, দুই একটা পাকা বাড়ি চোখে পড়লো । কতগুলো রিকশা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপাশে ।

খেতে শুরু করতেই আমি বললাম, এ জায়গার বৈশিষ্ট্য কি?

মামা বলতে লাগলেন,

এ পাশে ধানি মাঠ আর ওপাশে শহর আর এর মাঝে আমার বাসা । রাতের বেলায় গানের আসর বসে রাস্তার ওপারে কারণ দুই-একটা শিল্প-গোষ্ঠী আছে এখানে । রাত-ভর গান গায় ।

- আর ?

মামা হেসে বললেন,

আরো একটা হলো, এখানে একজন লোক আছে, যে রাত-ভর হেঁটে বেড়ায় । সবাই যখন কাজে যায়, তখন ওর ঘুমানোর সময় । জন্মের পর থেকেই ওরকম ।

আমি সাথে সাথে বললাম, আমাকে দেখাতে পারবে ?

- ইয়েস পারবো । রাত হলে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যায় । ঘন্টা খানেক পরে আবার ফিরে আসে, আবার যায় । লোকটা বিয়ে করেছিল গত বছর, কিন্তু টিকেনি । বউ তালাক দিয়ে চলে গেছে ।

আমি বললাম, তোমার সাথে কথা হয়েছে ?

- অনেক বার । হেসে হেসে কথা বলে । কোন দুঃখ আছে বলে মনে হয় না । ফূর্তিতে থাকে ।

আমি বললাম, তাহলে কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে রাত-বিরেতে হাঁটাই ভাল, ফুর্তিতে থাকা যাবে ?

মামা সাথে সাথে বললেন, তাহলে লোকটার সাথে তোকে জুড়ে দেই যেন রাত-ভর হাঁটতে পারিস ?

আমি হেসে বললাম, আমি রাজি । আউলাদের সাথে থাকতে আমার ভালই লাগবে । তো লোকটা কখন হাঁটা দেবে ?

- এই ধর, নটার পরে ।

- ঠিক আছে । আমরা ওকে ফলো করবো যতখানি করা যায় ।

এ পাশ থেকে বাবলু বললো, আমাকেও নিও ।

- আমি বাদ পড়ছি কেন ? এ পাশ থেকে মা বলে উঠলেন ।

শীত পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশে আর এই আধা-শহর, আধা-পল্লীতে, সন্ধ্যে পড়তেই শীতটা জেকে ধরলো । আমরা রীতিমত সোয়েটার গায়ে চাপিয়েছি । বাড়ির আশেপাশে ঝি-ঝি ডাকতে শুরু করেছে । জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, অদূরে থানার পুলিশ বড় বড় কোট চাপিয়ে পাহাড়া দিচ্ছে । কয়েকজনকে দেখলাম ভারি সোয়াটার গায়ে চাপিয়েছি । শিশির পড়ছে সারা শহর জুড়ে ।

আমরা ভাল মতন জামা-কাপড় চাপিয়ে রাতের ডিনার শেষ করে বসে আছি লোকটার আপেক্ষায় । ঠিক নটায় মামা বললেন, ঐ যে আসছে । আমরা ঘরের লাইট বন্ধ করে জানালায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম । আবছা আধারে দেখলাম একটা সাদামাটা মানুষ । বয়স চল্লিশের মতন, সুন্দর করে দাড়ি-গোফ কামানো । নিচে মোটা পাজামা পড়েছে, গায়ে ভারি কোট । মাথায় কাপড় জড়ানো । ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকটা । হাটার ধরন দেখেই বোঝা গেল এটাই ওর কাজ এবং এ কাজে প্রচুর অভিঙতা আছে ।

বাবলু বললো, মামা, তুমি কখনো জানতে চেয়েছে ও কেন হাঁটে ?

- ইয়েস । আমি কেন, সবাই জানতে চায় । সাথে সাথে জবাব দেয় ও ।

- কি জবাব দেয় ? মা জানতে চাইলো এ পাশ থেকে ।

লোকটা বলে,

আল্লাহ আমাকে রাতে হাঁটা আর দিনে ঘুমানোর ব্যবস্থা দিয়েছেন । এইটে আল্লাহর কুদরতি । আলাপ করবি লোকটার সাথে ? ডাকলেই আসবে ।

আমি হ্যাঁ বলতে নিয়ে পিছিয়ে গেলাম । বললাম, তার চেয়ে দূর থেকে দেখি ।

বাবলু আর মা আমার কথায় সায় দিল ।

দেখতে দেখতে লোকটা মিলিয়ে গেল রাস্তার ওপারে ।

মামা বললেন,

ঘন্টা খানেক পরে আবার উদয় হবে । তোমরা যদি সারারাত বসে থাক, অন্তত চার বার দেখবা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে ।

বাবলু সাথে সাথে বললো, ওর নাম কি?

- আসল নাম নুডুল কিন্তু সবাই রাইতের-জিন বলে ডাকে । রাইতের-জিন বলে ডাকলে ও কিছু মনে করে না ।

আমি বললাম, ও কোন ভেলকি-টেলকি দেখাতে পারে ?

- না । সে রকম কিছু কখনো শোনা যায়নি ।

- ওর বাবা-মা জীবিত আছে ?

- আছে । ওর সাথেই থাকে ।

রাইতের-জিন দর্শন শেষ হয়েছে । এবার ঘুমানোর পালা । আমি আর মা পাশের ঘরে শোব । মামা গেলেন ওদিকে বাবলুকে নিয়ে । আধা-পল্লী, আধা-শহরে রাত দশটা মানেই অনেক । আমি আর মা চলে এসেছি আমাদের ঘরে । মা শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন ।

আস্ত বড় লেপটা মাথা মুড়ে শুয়ে পড়েছি । লেপের উষতা এসে আমাকে আরাম দিতে লাগলো । টিপ টিপ করে শব্দ হচ্ছে ছাদে । বুঝলাম শিশির পড়ছে টিনের চালে । খুব মজা লাগছে লেপের ভেতরে । আরো এক প্রস্ত লেপ জড়িয়ে নিলাম । কিন্তু ঘুম আসছে না । সম্ভবত নূতন জায়গা বলে ঘুম আসতে দেরি হবে ।

ঘড়িতে দেখলাম রাত এগারটা । আর কতক্ষণ এপাশ-ওপাশ করবো ?

লেপ-কাথা সরিয়ে মস্ত সোয়েটারটা চাপিয়ে নিলাম । তারপর ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি । সামনেই খোলা উঠোন । ওখানে ছোট ছোট গাছ লাগানো আছে । আর উঠোনের মাথায় আম গাছ । আম গাছের পাশ দিয়ে থানা চোখে পড়লো । দেখলাম একজন সেন্ট্রি পা থেকে মাথ অবধি ওভারকোট চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । ওদিক থেকে ভেসে আসছে গান-বাজনার আওয়াজ, গায়করা আসর বাধিয়েছে ।

সাধারণত শীতকালে যখন বর্ষার প্রাদুর্ভাব থাকে না, তখনি গান-বাজবার আসর বসে । রাত-ভর চলবে ওদের গান-বাজনা ।

বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছি । উপরে তাকাতেই হাজারো নক্ষত্র এসে ভির করলো । ঢাকা শহরে হাজারো আলোর আড়ালে আকাশ ঢাকা পড়ে । আকাশে যে এত নক্ষত্র ছিটিয়ে আছে, গ্রাম দেশে না এলে বোঝবার যো নেই । নক্ষত্রে নক্ষত্রে ছেয়ে আছে চারিপাশ ।

বারান্দা থেকে লম্বা চেয়ারটা এনে উঠোনে ফেললাম । তারপর লম্বা-লম্বি ভাবে শুয়ে পড়েছি । নক্ষত্রের আকাশ চলে এলো মাথায় । মনে পড়লো রাইতের-জিনের কথা । লোকটা নিশ্চয় এখন হেঁটে বেড়াচ্ছে আগাড়ে-পাগাড়ে । কেন হাঁটছে, জিঙাসা করলে বলতে পারবে না । শুধু জানে পা ফেলতে হবে । এই লোকটার সাথে আরেক জনের খুব মিল । সে হলো মিশকাত ।

হাতের কাছে মোবাইল ছিল । দেরি না করে বোতাম টিপে দিলাম । ফোন বাজছে ।
ওপাশ থেকে মিশকাত বলে উঠলো, কেমন আছেন ?
- ভাল । আপনি ?
- এই তো চলে যাচ্ছে ।
আমি বললাম, সরি, আপনাকে রাত-বিরেতে ফোন দিতে হলো । একটা কথা না বলে পারছি না ।
মিশকাত হেসে বললো,

আপনি মিছেমিছি বলছেন রাত বিরেত, কেবল তো এগারটা । তো বলুন, জামালপুর কেমন লাগছে ? এখন তো খুব শীত ।

আমি বললাম,

সে কথা বলতেই ফোন দিয়েছি । একটু আগে একটা লোকের সাথে দেখা হলো । লোকটা রাত-ভর হাঁটে, নাম রাইতের-জ্বিন । একটু আগে আমাদের সামনে দিয়ে গেল । আমি ভেবেছিলাম এই দলে আপনি একাই । এখন দেখছি আরো লোকজন আছে ।

- সত্যিই বলছেন লোকটা রাত ভর হাঁটে ?
- এই মাত্র নিজের চোখে দেখে এলাম ।

মিশকাত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, ইচ্ছে করছে লোকটাকে দেখতে । একবার দেখাতে পারেন ?

- অবশ্যই । আপনাকে মামার ফোন নম্বর দেবো । আপনি সময় মতন দেখে যেয়েন ।

মিশকাত হেসে বললো, ঠিক আছে ।

আমি বললাম, আপনাকে একটা পারসোনাল প্রশ্ন করি ?

- করেন ।

- ধরেন, আপনি বিয়ে শাদি করেছেন । ঘরে ছেলেপুলে আছে । তখনো কি রাস্তায়-রাস্তায় হেঁটে বেড়াবেন ?

মিশকাত চুপ হয়ে গেল । উত্তর দিচ্ছে না ।

আমি বললাম, চুপ হয়ে গেলেন ?

- কি উত্তর দেবো সেটাই ভাবছি, কারণ ব্যাপারটা কখনো ভেবে দেখিনি তবে উত্তরটা পেলে আপনাকে জানাবো । কদিন সময় দিন । এ কথা জানতে চাইছেন কেন ?

- না এমনি । যে সব মেয়েদের স্বামীরা রাস্তায়-রাস্তায় হেঁটে বেড়ান, তাদের জীবন নিশ্চয় সুখকর নয় ?

- হয়তো তাই, মিশকাত আস্তে করে বললো । রাইতের জিন কি বিবাহিত ?

- বিয়ে করেছিল, টিকেনি । বউ চলে গেছে ।

মিশকাত আবারও চুপ ।

আমি বললাম, ঠিক আছে, এখন রাখি ।

মিশকাত আমার কথা এড়িয়ে গিয়ে বললো, এখন তো অনেক রাত, গ্রাম-দেশের জন্য তো বটেই । তো কি করছেন, জানতে পারি ?

- উঠোনে বসে আছি আর তারা গুণছি, এই বলে হেসে দিলাম ।

- আপনি কি সত্যি সত্যি তারা গুণছেন ?

- কেন, আপনার বিশ্বেস হয় না ?

মিশকাত বলতে লাগলো, বাংলার নবাব একবার রাজা কৃষ্মচন্দ্রকে আকাশের তারা গুণতে বলেছিলেন । আপনি কি সে রকম কোন আদেশ পেয়েছেন ?

আমি সাথে সাথে বললাম, আপনি কি গোপাল-ভার থেকে বলছেন কথাটা ?

- ঠিক তাই, বলে মিশকাত হেসে দিল । বললো, ঠিক আছে তারা গুনুন, এটা দোষের কিছু না । সাথে সাথে আদম-সুরতটা বের করবার চেস্টা করবেন ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

আদম-সুরতের কথা শুনেছি কিন্তু কখনো খুঁজে পাইনি । আপনি কি গাইড করতে পারেন ? আদম-সুরতটটা কি ?

- আদম মানে মানুষ আর সুরত হলো আকার । একটা আস্ত মানুষ আকাশের বুকে দাঁড়িয়ে আছে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে । এটাই আদম-সুরত ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

মিশকাত বলতে লাগলো,

কতগুলো তারা এমনভাবে ঝুলে আছে, আপনার মনে হবে একজন মানুষ কোমরে তরোয়াল গুজে দাঁড়িয়ে আছে ।

আমি সাথে সাথে বললাম, আমাকে সাহায্য করবেন ? আমার ঠিক উপরেই আকাশ । তারায় তারায় ভরা ।

মিশকাত চুপ হয়ে গেল । বললো, এখান থেকে গাইড করা খুব শক্ত হবে । এটা হাতে-হাতে না দেখিয়ে দিলে দেখানো যাবে না ।

- তারপরেও চেষ্টা করুন, আমি তাড়া দিয়ে বললাম ।

- ঠিক আছে, প্রথমে তরোয়ালটা বের করবার চেস্টা করেন । দেখেন তিনটে তারা এক লাইনে বাঁকা হয়ে নিচের দিকে ঝুলে আছে । সেটাই আদমের তরোয়াল । এ তরোয়ালটাটা বের করতে পারলে হাত-পা-মাথা শনাক্ত করা শক্ত হবে না ।

আমি খুঁজতে লাগলাম তিন তারার তরোয়াল । ডানে-বায়ে, উপরে-নিচে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম । কোথাও নেই । এভাবে পনেরো মিনিট কেটে গেল ।

আমি বললাম, মিশকাত সাহেব, এরকম কিছু নেই ।

মিশকাত হেসে বললো, আছে কিন্তু লাখো তারার মধ্যে মিশে গেছে । হাতে হাতে ধরিয়ে না দিলে বের করতে পারবেন না ।

- আপনাকে একটা অনুরোধ করি ?

- করুন ।

- এবার ঢাকায় এলে আমাকে আদম-সুরত দেখাতে হবে ?

- তাহলে তো আপনাকে আমার সাথে রাত-বিরেতে বের হতে হবে । শহরের আলোয় এসব দেখানো যাবে না ।

আমি বললাম, সে ব্যবস্থা আমি করবো । আমি আপনাকে ঢাকার অদুরে নিয়ে যাবে । সেখানে আমাকে দেখাবেন ।

মিশকাত হেসে দিল । কিছু বললো না ।

আমি বললাম, তা হলে ঐ কথাই রইলো । আজ তা হলে রাখি । সোমবার দেখা হচ্ছে ।

মিশকাত বলে উঠলো, ফোনটা এখনি ছাড়বেন না । একটু ওয়েট করেন, যদি আপত্তি না থাকে ?

- ঠিক আছে, আমি ওয়েট করছি ।

একটু পরে টেপ রেকোর্ডারে চাপ দেবার শব্দ পেলাম । একটা গান বেজে উঠলো,

আহা আজি এই বসন্তে এতফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়,

ঘড়িতে দেখলাম বারটা-এক । এর মানে আজ নববর্ষ ।

মিশকাত বলে উঠলো, আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা নিন ।

আমি হেসে বললাম, আমি একদমি ভুলে গিয়েছিলাম । আপনিও আমার শুভেচ্ছা নিন । তবে এবারি প্রথম বাবা-মার আগে কেউ আমাকে শুভেচ্ছা দিল ।

মিশকাত বললো, সব সময় তো বাবা-মা আগে দেবে না । বাবা-মার বাইরেও তো অনেকে আছে ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

মিশকাত চুপ হয়ে গেল । ।

- কৈ কথা বলছেন না ?

মিশকাত বলতে লাগলো,

যখন ছোট ছিলেন, তখন বাবা-মার শুভেচ্ছা পেয়েছেন । যখন বড় হলেন, তখন অনেকের সাথে পরিচয় হবে । তারাও শুভেচ্ছা দেবে । আপনি চাইলেও না করতে পারবেন না কারণ তারাও আপনাকে পছন্দ করে ।

আমি বললাম, আরো একটু খোলাসা করুন ।

মিশকাত কথা ঘুরিয়ে বললো, গানটা কেমন লাগলো ? আমি কিন্তু আপনাকে শোনাবো বলে আগে থেকে রেডি করে রেখেছিলাম ।

- অবশ্যই ভাল তবে আমি লালন ভক্ত ।

মিশকাত একটু থেমে বললো, লালন আর রবীন্দ্রনাথ একই । লালন যা যা বলেছে, রবীন্দ্রনাথও তাই, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

- সেটা হলো, ওরা দুজনেই প্রেমিক । প্রেমের পথে ওরা সমানে-সমান । আসলে ওরা একই বৃত্তের মানুষ ।

- আপনি মনে হয় খুব রবীন্দ্রনাথ পড়েন ?

মিশকাত একটু চুপ থেকে বললো,

পড়ি কিন্তু বুঝি না । বার বার পড়ি তারপরেও বুঝি না । আসলে উনি ঠিক কি বলতে চেয়েছে, সেটা আজো আবিস্কার করা গেল না । সুতোটা হাতের কাছে আসে, ধরতে যাই, ও সরে যায়, আবার হাতের কাছে আসে, হাত বাড়িয়ে দেই । দেখি সূতোটে অন্য দিকে সরে গেছে । ফলে আর ধরা যায় না ।

আমি বললাম, কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্য তো অনেকেই বিশ্লেষণ করেছেন ?

- ইয়েস করেছেন, যতটুকুন বোঝা যায়, কিন্তু আসলে রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন, সেটা কেউ বলতে পারবে না ।

- কেন, পারবে না কেন ?

মিশকাত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, আকাশে কটা তারা আছে, সেটা কি গুণতে পারবেন ? চেস্টা হয়তো করতে পারবেন, এর চেয়ে বেশি না ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ হয়ে গেলাম । বসে বসে রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতে লাগলাম ।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, আপনার সময়ের জন্য ধন্যবাদ । সোমবার দেখা হচ্ছে, শুভ রাত্রি ।

- ঠিক আছে, এই বলে মিশকাত আর কথা বাড়ালো না ।

আমি লাইন কেটে দিয়েছি । তারপর ঘরে এসে মার পাশে শুয়ে পড়লাম । কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম চলে এলো । আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ।

আমি দেখলাম একটা ঘরে বসে আছি । ঘরটা চারিদিক থেকে আটকানো । আমার পাশে মিশকাত বসে আছে । শক্ত করে ধরে রেখেছে আমার হাত ।

আমি বলে উঠলাম, কি ব্যাপার, ঘরে তালা কেন ? আমার হাত ছাড়ুন ।
মিশকাত বললো, এটা আমার বাবার লাইব্রেরি । বাবা সব সময়ে তালা দিয়ে রাখেন ।
আমি বললাম, তালা খুলুন, আমি বাইরে যাব ।

মিশকাত তালা খুলে দিল । দেখলাম আলো এসে পড়ছে লাইব্রেরী ঘরে । হাজারো বইয়ে ঠাসা পুরোটা ঘর ।
আমি কিছুক্ষণ পরে বললাম, ঠিক আছে, এখন বাইরে যাব না । এখানে চা পাওয়া যাবে ?
মিশকাত বলে উঠলো, বাবার লাইব্রেরীতে এসবের ঘাটতি নেই । একটু বসুন ।

একটু পরে ছেলেটে চা নিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে । আমি তাকিয়ে দেখলাম মিশকাতের মাথা দরজার চৌকাঠে ঠেকেছে ।
- নিন, বলে গরম চা বাড়িয়ে দিল ।

আমি দ্রুত চুমুক দিতে গিয়ে মুখ পুড়ে ফেললাম । ফলে গরম চা ছিটকে পড়লো জামায় । ধরফর করে উঠে বসেছি । দেখলাম সূর্যের আলো ঢুকছে জানালা দিয়ে । পাশের ঘরে মামার হাকডাক চলছে মার সাথে । কি নিয়ে যেন ওরা তর্ক বাধিয়েছে । ঘড়িতে দেখলাম সকাল সাতটা ।

আমার খুব হাসি পেল । নিজের মনে অনেকক্ষণ হাসলাম, তারপর লেপটা মুড়ে আবারও ঘুমিয়ে পড়লাম ।

।। ১০ ।।

রেজিস্ট্রি বিল্ডিং

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মধ্যেই রেজিস্ট্রি বিল্ডিং । অপরাজয় বাংলাকে পেছনে ফেলে একটু এগিয়ে গেলে খোলা-জায়গা । সেই জায়গা পার হলে লম্বা মতন বিল্ডিং আর সেটাই আমাদের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং । ওখানে সোমা অপেক্ষা করবে সকাল দশটায় আমার জন্য ।

অপরাজয় বাংলাকে পেছনে ফেলে হাঁটা দিয়েছি । একটু হাঁটতেই চটপটির দোকান চলে এলো । ওদিকে দেখলাম মিছিল ধেয়ে আসছে । ক্যাম্পাস আজ উত্তপ্ত, চারিদিকে মিছিল ।

চটপটির দোকান পেছনে ফেলে মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটা দিয়েছি । একটু হাটতেই হলুদ বিল্ডিং চলে এলো ।

রেজিস্ট্রি বিল্ডিং এর গেটে দেখলাম সোমা দাঁড়িয়ে আছে । আমাকে দেখে হাত নাড়লো । আমি জোড়ে হাঁটা দিয়েছি যেন তাড়াতাড়ি পৌছাতে পারি । হঠাৎ দেখলাম এক দল ছেলে দৌড়ে আসছে ওদিক থেকে । ওদের হাটে লাঠি-সোটা । মুহুর্তেই দৌড়াদুড়ি শুরু হয়ে গেল চারিদিকে । আমি হুড়মুড় করে দৌড় দিলাম রেজিস্ট্রি বিল্ডিংয়ের দিকে আর তখনি শুরু হলো গুলি । আমি জোড়ে দৌড়াতে গিয়ে পড়ে গেলাম ইটের সাথে বাড়ি খেয়ে । পড়ে গিয়ে আবার উঠবার চেস্টা করছি কিন্তু দাড়াতে পারলাম না । বুঝলাম পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে, চাইলেও এগুতে পারবো না । তাকিয়ে দেখলাম আমি একাই পড়ে আছি মাঠে আর দু দিক থেকে ঝাকে ঝাকে গুলি উড়ে আসছে ।

এখানে শুয়ে থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয় কিন্তু দেয়ালের ওপাশে যে সরে যাব, সেটাও সম্ভব নয় এই ফ্র্যাকচার নিয়ে । অসহায়ের মতন কাঁদতে লাগলাম ।

একটু পরে দেখলাম কে যেন আমার দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে । কাছে আসতেই বুঝলাম সোমা ।

আমি চিৎকার করে বললাম, সোমা, এদিকে আসিস না । গায়ে গুলি লাগবে ।
বলতে বলতে সোমা এসে হাজির হলো তারপর আমাকে টেনে হিচরে দেয়ালের ওপাশে নিয়ে গেল । এ জায়গাটা নিরাপদ । আর যাই হোক গুলি এসে গায়ে লাগবে না ।

তিনদিন হাসপাতালে পড়ে রইলাম ।
ডাক্তার বললো, পা ভাঙেনি তবে ভাল মতন মোচকে গেছে । অন্তত এক সপ্তাহ শুয়ে থাকতে হবে ।
সোমা এসে বললো, এখন কি করবি ?
- কিছু করবো না । আমাকে জড়িয়ে ধর ।
হেসে দিল মেয়েটা । বললো, কেন জড়িয়ে ধরতে বলছিস কেন ?
- না এমনি ।
সোমা বলে উঠলো, জড়িটে-টড়িয়ে ধরতে পারবো না আমি । এসব ন্যাকামি আমি একদম পছন্দ করি না ।
- তাহলে হাতটা দে ।
সোমা হাত বাড়িয়ে দিল ।
আমি ওর হাত ধরে বসে রইলাম । কোন কথা বললাম না ।

দুপুরে মা খাবার নিয়ে এলো । ডিম ভাজা আর মুরগির সুপ । ডিম ভাজা আমার সবচেয়ে প্রিয় । দেখলাম বাবলু একটা গল্পের বই এনেছে ।

আমি বললাম, ফুলি খালা, তুমি এখন যাও । কাল থেকে বসে আছো । তোমার ছেলেপুলে নাই ?
খালা বললো, তুই খেয়ে নে । তারপর যাই ।
- না, তুমি আগে যাবে । তুমি না গেলে আমি খাব না ।
ফুলি খালা কিছু বললো না । আস্তে আস্তে হাঁটা দিলো । একটু পরে ফিরে এসে বললো, তোর মুরগির ঝোল খেতে ইচ্ছে করে ?

আমি উত্তর না দিয়ে বললাম, তুমি এখন যাও । আজ আর আসবে না । আমার কিছুই হয়নি ।

ফুলি খালা সোমার কাছে গিয়ে বললো,

তোমার জন্য আমি দোয়া করবো সব কিছু দিয়া । তুমি সাচ্চা মানুষ, এই বলে খালা বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগলো । বুঝলাম সোমার জন্য দোয়া করছে খালা ।

বিকেলে রোকেয়া খালা ফোন করলো আমেরিকা থেকে । খালা বললো, তোমার বাংলাদেশে থেকে কাজ নেই । তুমি বাকী পড়াটা আমেরিকাতে এসো করো । আমি সব ব্যবস্থা করছি ।

আমি বললাম, দেখি খালা কি করি । আমার জন্য দোয়া করবেন ।

- রুমি একটু কথা বলতে চাচ্ছে তোমার সাথে । দেবো ?

- দিন ।

রুমি বললো,

আমাদের শহরে কয়েকটা ভাল ইউনিভার্সিটি আছে । আপনি চাইলে ক্রেডিট ট্র্যান্সফার করে চলে আসতে পারেন । যদি বলেন তো খোঁজ নেই ?

আমি হেসে বললাম, আপনাকে জানাবো ।

রুমি আমার কথা শেষ হবার আগেই বললো, আমেরিকায় সুবিধে হলো, পড়াশোনাটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবেন । এখানে কোন সেশন জট নেই ।

আমি একটু থেমে বললাম, আসলে খুব একটা সিরিয়াস কিছু হয়নি । আপনারা অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন ।

রুমি হেসে দিল । বললো, আপনি কি ঠিক বলছেন যে সিরিয়াস কিছু হয়নি ?

আমি চুপ করে গেলাম । কিছুক্ষণ পরে বললাম,

ব্যাপারটা আপনাদের ওখানে ঘটলে হয়তো হুলস্থুল পড়ে যেত কিন্তু এদিকে সমস্যা হয় না । আমাদের সয়ে গেছে ।

রুমি আমার সাথে তর্কে গেল না কিন্তু বুঝলাম ও আমার কথা মানলো না ।

দূর থেকে দেখলাম একটা লম্বা-শুকনা মানুষ হাসপাতালের করিডর দিয়ে আসছে । যে কেউ বলে দিতে পারবে এটা মিশকাত ।

মিশকাত হেসে বললো,

আপনার হাসপাতালে পড়ে থাকাটা দেখে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এই ভেবে ভাল লাগছে আপনার নূতন কিছু শেখা হয়েছে, যেটার সূযোগ হয়তো কখনো পেতেন না ।

আমি বললাম, কিন্তু শিখতে গিয়ে মৃত্যু যদি হতো ?

মিশকাত চুপ হয়ে গেল । বললো, তাহলে শেখবার দরকার নেই । আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি ।

আমি হেসে দিলাম । বললাম, একটু ফাজলামি করলাম আপনার সাথে ।

মিশকাত বললো, কদিন থাকতে হবে হাসপাতালে ?

- দিন তিনেক ।

- তাহলে বাবার লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেব ?

আমি বললাম, এখন আর পড়তে ইচ্ছে করছে না কারণ ব্যাপারটা বার বার মনে পড়ছে । কি ভয়ঙ্কর গোলাগুলি । সোমা ছিল বলে বেঁচে গেছি এ যাত্রায় ।

মিশকাত কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,

আপনি সেরে উঠলে আপনাকে নিয়ে আশুলিয়া যাব । সারাদিন থাকবো । দেখবেন এসব কাটিয়ে উঠতে পারছেন ।

আমি বললাম, সোমাকেও নিয়ে যাব ।

মিশকাত সাথে সাথে বললো, তাহলে তো খুব ভাল হয় । এবার আমরা নৌকায় ঘুরবো তারপর আদম-সূরাত দেখে বাড়ি ফিরবো ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । কিছু বললাম না ।

॥১১॥

আদম-সুরত

আদম-সুরত দেখতে আমরা এসেছি আশুলিয়ায় । সোমার আসার কথা ছিল কিন্তু আসতে পারেনি । হঠাৎ কুমিল্লা যেতে হয়েছে ওকে । আমি আর মিশকাত এসেছি । বাড়ির গাড়ি করে এসেছি । রাতেই ফিরে যাবে ।

আশুলিয়াতে কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আছে যেগুলো আশুলিয়া জলা-ভূমির দিকে মূখ করে দাড়িয়ে আছে । এরি একটাতে আমরা আস্তানা গাড়লাম । এই রেস্টুরেন্টটা সন্ধ্যের পর খোলে, চলে সারারাত । ভোর হলে বন্ধ হয়ে যায়, আবার খোলে সন্ধ্যের পর । ঢাকা থেকে লোকজন আসে রাতের জলাশয় দেখতে । আমরা এসেছি আদম-সুরত দেখতে ।

এই রেস্টুরেন্টের ভেতরে বসার জায়গা আছে, পেছনে ঝুলন্ত বারান্দা । সেখানে বসে লোকজন ডিনার খায় । ঐ বারান্দায় বসলে সামনের বিস্তৃত জলাশয় সামনে চলে আসে আর ধুপ-ধুপ করে জ্বলতে থাকা আকাশের তারাকারা ।

আমরা পেছনের বারান্দায় বসলাম । ওদিকে দুই একটা পরিবার বসেছে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে । আমরা এখানে রাতে খাব তারপর আদম-সূরাত দেখে বাড়ি ফিরবো ।

আমি বললাম,

ঢাকা শহরের আশে-পাশে সব জলাশায় ভরে গেছে । এখন এটাও যদি ভরে যায়, আমাদের শ্বাস নেবার জায়গা থাকবে না । ডিনার দিতে বলি ? আপনি তো আমার মেহমান ।

মিশকাত হাসলো, কিছু বললো না ।

আমি বললাম, কি খাবেন ?

- আপনি যা খাবেন, তাই ।

আমি ওপাশে গিয়ে অর্ডার দিয়ে এলাম । ওরা বললো ত্রিশ মিনিটের মতন লাগবে । আপতত ড্রিংকস দিচ্ছি ।

মিশকাত ড্রিংকস খেতে খেতে বললো, খাবার আসতে দেরি আছে । চলুন, আদম-সুরতটা খুঁজে বের করি ।

আমি আকাশে তাকালাম ।

মিশকাত বললো, বসে বসে খুঁজতে গেলে সুবিধে হবে না । চলুন, ঐ দিকটাতে দাঁড়িয়ে দেখি ।

আমরা হেঁটে বারান্দার শেষ প্রান্তে চলে এসেছি ।

মিশকাত বললো, একটু দাড়ান, আগে আমি খুঁজে বের করি । তারপর আপনাকে দেখাবো, এই বলে খুঁজতে লাগলো ।

কিছুক্ষণ পরে বললো,

ইয়েস পেয়েছি, এই বলে আঙুল খাড়া করলো । আপনি এই আঙুল বরাবার তাকান । তিনটে তারা, তরোয়াল হয়ে নিচের দিকে ঝুলে আছে ।

আমি মিশকাতের আঙুল বরাবর তাকালাম কিন্তু তিন-তারার কোন তরোয়াল চোখে পড়লো না ।

মিশকাত বললো, আবার তাকান । একটু সময় লাগতে পারে । তিনটে তারা লম্বালম্বি ঝুলে আছে ।

দশ মিনিটের মাথায় চোখে পড়লো তিনটে তারা, চাদের মতন বাঁকা হয়ে নিচে ঝুলে আছে ।

- ইয়েস পেয়েছি, বলে লাফিয়ে উঠলাম ।

মিশকাত বলতে লাগলো,

তলোয়ারটা কোমরে গুজে দাঁড়িয়ে আছে আদমটা । বুঝতেই পারছেন হাত-পা-মাথা খুব কাছাকাছিই হবে । তবে হাত-পা-মাথা একটি তারা দিয়ে করা । তলোয়ার বরাবার উঠে যান, দেখবেন একটি তারা, ওটি ওর মাথা, আর নিচে দুটো, এগুলো দুই-পা আর দুই-হাত ।

আমি বললাম, আমাকে একটু সময় দিন ।

আমি তরোয়ালটা মেলাবার পর উপরে উঠে গেলাম । দেখলাম একটা তারা । বুঝলাম এইটে মাথা, তারপর ধীরে ধীরে ডানে নেমে দুটো তারা দেখলাম । বুঝলাম এ দুটো হাত । তারপর তলোয়ার বরাবার নিচে নেমে এসেছি । সেখানে দুটো তারা দেখলাম, বুঝলাম এগুলো পা । আবার তাকালাম পুরো চিত্রটার দিকে । সত্যি সত্যি একটা আদম কোমরে তরোয়াল গুজে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

আমি বললাম, ইয়েস, পেরেছি । আপনাকে ধন্যবাদ ।

মিশকাত হেসে বললো, আপনি আদমের দেখা পেয়েছেন, সেটাই বড় কথা । আর না হলে আশুলিয়া আশাটা ব্যর্থ হয়ে যেত ।

- কেন, ব্যর্থ হবে কেন ? এ জলাশয়ের ধারে ডিনার খাওয়া কম কি ? চলুন ডিনার করি ।

টেবিলে এসে দেখলাম ওরা ডিনার দিয়ে গেছে । আমি পানি খেতে খেতে বললাম, এই আদম সূরাতের নাম কি ?

- নাম হয়তো একটা আছে কিন্তু এই মুহূর্তে বলতে পারছি না ।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো । দেখলাম সোমা ফোন করেছে ।

সোমা বললো, তোদের আদম-সুরাত দেখা হলো ?

- এই মাত্র দেখলাম ।

- আমাকে দেখাবি এবার, ঠিক ?

- এখন কোন সমস্যাই হবে না । আস্ত একটা মানুষ আকাশে দাঁড়িয়ে আছে ।

- তোরা কখন ফিরছিস ?

- এই তো ডিনার করে । মিশকাতের সাথে কথা বলবি ?

মিশকাতকে ফোন বাড়িয়ে দিলাম । মিশকাত কথা বলতে লাগলো ।

মিশকাত বললো, তুমি আসলে খুব ভাল হতো । আদম-সূরাত দেখতে পারতা ।

- ঠিক আছে, এর পরের বার । আমার খুব হিংসা লাগছে তোমাদের দেখে । এর পরের বার পুষিয়ে নেব ।

মিশকাত হেসে দিল । কিছু বললো না ।

।।১২।।

চিঠি

ক্লাস চলেছ হাফিজ স্যারের । ডিভিডেন্ট চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছেন স্যার । আমি পাঁচ বেন্চ পরে বসেছি । সোমা আজ সামনে বসেছে, ওদিকে মিশকাত । ক্লাসের ফাঁকে খেয়াল করলাম, মিশকাত কটকটে নীল জামা পড়েছে । ছেলেদের কটকটে রঙে একদম বোকা বোকা লাগে, তারপরেও ওকে ভাল লাগছে পেছন থেকে । আসলে ওকে ভাল লাগছে অন্য কারণে । ছেলেটা ভুল বলুক আর ঠিক বলুক, সেটা বড় কথা নয় । ও যে সব কিছু জানতে চায়, সেটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ।

আমি দেখলাম ছেলেটা শেভ করে না কদিন হলো । খোচা খোচা দাড়ি উঠেছে । একটা ঝাড়ি না মারলেই না । সব কিছু নিয়ে ভাবলেই তো লেখাপড়া হলো না, পরিস্কার হয়ে আসাটাও একটা লেখাপড়া । তবে আমার হাকডাকে মিশকাত আর জামার বোতাম খোলা রাখে না । আটসাট আটকিয়ে ক্লাসে আসে । কিন্তু ঠিক মতন শেভ না করার ব্যাপারটা নিয়ে ঝগড়া করতে হবে । পরক্ষণেই মনে হলো, আমি কেন ঝগড়া করতে যাব ? শেভ করাটা ওর নিজস্ব ব্যাপার । কিন্তু পরে মনে হলো, এ নিয়ে দুই-এক কথা না শোনালে স্বস্তি পাব না । কিন্তু কেন স্বস্তি পাব না, সেটা মনে হতেই খুব হাসি পেল ।

বিকেলের মধ্যে সব ক্লাস শেষ হয়ে গেল । এখন ঘরে ফেরবার পালা । হাঁটতে হাঁটতে লাইব্রেরির কাছে চলে এসেছি । এখান থকে রিকশা নিয়ে বাড়ি যাব । আজ আমি শাড়ী পড়েছি, তাই আস্তে আস্তে পা ফেলতে হচ্ছে । দূর থেকে দেখলাম মিশকাত এদিকে আসছে ।

আমি বললাম, কি ব্যাপার, কটকটে নীল সার্ট পড়েছেন ?

- কেন খারাপ লাগছে ?

- না খারাপ লাগবে কেন ? দূর থেকে বোঝা যায় কেউ একজন আসছেন কটকটে পড়ে ।

মিশকাত হেসে দিল । বললো, এই নিন । আপনার জন্য এনেছি ।

আমি হাতে নিয়ে দেখি রাশিয়ান লেখকদের বই । শক্ত মজবুত মলাটে জড়ানো, সম্ভবত কাপড় দিয়ে মলাট বেধেছে ওরা ।

আমি বললাম, রাশিয়ার বই কোথায় পেলেন ? এখন তো এসব পাওয়া যায় না ।

- বাবার এক্সট্রা কপি ছিল । আপনার রাশিয়া প্রীতি দেখে বাবা পাঠিয়ে দিলেন ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

মিশকাত বললো, এখন চলি । ওদিকে একটু যেতে হবে, এই বলে তড়িঘড়ি করে চলে গেল ।

আমি ডাকতে নিয়ে ডাকলাম না ।

আমি রিকশায় চেপে বসেছি । রাস্তায় জ্যাম না হলে আছরের নামাজ বাসায় পড়তে পারবো । আস্তে আস্তে বইগুলো খুলতে শুরু করেছি । পাতা খুলছি আর বইয়ের আষটে-জমানো গন্ধ নাকে আসছে । কি সুন্দর ঝকঝকে লেখায় ভরা পাতাগুলো । মনে হয় বার বার পড়ি ।

প্রথম বইটা দেখা হয়েছে । দ্বীতিয় বইটা খুলতেই একটা কাগজ গড়িয়ে পড়লো । চট-জলদি ধরে ফেলেছি । একটু হলেই রিকশার তলায় হারিয়ে যেত । কাগজটা খুলে দেখলাম দুই-এক লাইনের চিঠি । মিশকাত লিখেছে ।

প্রিয় রুশা,

আপনাকে আদম-সূরত দেখাতে পেরে খুব ভাল লাগছে । তবে আরো ভাল লাগতো যদি জীবন-ভর দেখাতে পারতাম । ভাল থাকবেন ।

মিশকাত

বইয়ের ভেতরে চিঠি পুরে পছন্দ প্রকাশ করবার ব্যাপারটা খুব সেকেলে । এখনকার ছেলে-মেয়েরা ওসবের ধার ধারে না । যা বলার সামনা-সামনি বলে । মিশকাতের কান্ড দেখে আমার খুব হাসি পেল । তবে ব্যাপারটা সেকেলেরি হোক আর একালেরি হোক, সেটা বড় কথা না । চিঠিটা পড়তে আমার খুব ভাল লাগতে লাগলো । আমি বার বার পড়তে লাগলাম, যতক্ষণ না রিকশাটা এসে বাড়ির সামনে দাড়ালো ।

এখন বুঝলাম ছেলেটা কেন বই দিয়ে তড়িঘড়ি করে চলে গিয়েছিল ।

।। ১৩ ।।

আবারও আশুলিয়া

সোমা তার মস্ত বড় পাজেরো নিয়ে এসেছে । ফুলি খালার একগাদা শাড়ি টেনে দেবে আদাবর থেকে গুলিস্তান মার্কেটে । তারপর আমরা বাড়ি ফিরে যাব ।

গুলিস্তানের কাজ শেষ হতে হতে বেলা এগারটা বেজে গেল । ফুলি খালা বললো, তোমরা চলে যাও । আমার ফিরতে দেরি হবে ।

আমি আর সোমা পাজেরো নিয়ে বাড়ি ফিরছি । কাকরাইলের কাছে আসতেই সোমা বললো, এখন তো ছুটি । চল আশুলিয়া যাই । কতদিন পরিস্কার বাতাস খাই না ।
কি হলো আমার, আমি রাজি হয়ে গেলাম । মাকে জানালাম ফোনে ।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে দিয়েছে আশুলিয়ার দিকে ।
সোমা বললো, মাঝে-মধ্যে ফুলি খালাকে আমি লিফট দেবো । আমাকে জানাস কখন লাগবে ।
আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । বললাম, সবচেয়ে ভাল হতো যদি খালাকে দোকান করে দেয়া যেত ?
সোমা বললো, তুই তো কদিন পরে আমেরিকা যাচ্ছিস, তখন দিতেই পারবি ।
আমি রাগ করতে নিয়ে করলাম না কারণ আমি রাগ করলে সোমা চেষ্টা করবে আরো রাগাতে ।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে আশুলিয়ে পৌছে গেলাম । আমি আর মিশকাত যেখানে বসেছিলাম, তার পাশেই লান্চ খেতে বসেছি । সোমা গিয়ে অর্ডার দিয়ে এলো ।

আমি বললাম, তোকে একটা কথা বলি ?

- বল ।

আমি বললাম, মিশকাত ছেলেটা কেমন ?

- কেন, এ কথা জানতে চাইছিস কেন ?

- আগে উত্তর দে ?

- ভাল তবে আউলা, এবার বল, কি হয়েছে ?

আমি চুপ হয়ে আছি । কথা বলছি না ।

- কথা বলছিস না যে ? সোমা তাড়া দিয়ে বললো ।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, মিশকাতকে আমার ভাল লাগে ।

সোমা কি একটা বলতে নিয়ে থেমে গেল । ও ভাবতে পারেনি আমি এরকম কিছু বলবো । একটু পরে বললো, মিশকাত আজ নিঃস্ব ।

- কেন, নিঃস্ব বলছিস কেন ?

- নিঃস্ব বলছি কারণ রুশা দেবী তার সবকিছু হরণ করে নিয়েছে । মিশকাতও মনে হয় তোকে পছন্দ করে । তোকে কিছু বলেছে ?

মিশকাতের চিঠির ব্যাপারটা বলতে নিয়ে বললাম না কারণ কারো ব্যক্তিগত কথা বলতে আমি পছন্দ করি না ।

আমি বললাম, ছেলেদের আবার বলতে কতক্ষণ ?

সোমা হেসে দিল । বললো, তোর রুমি ভাইয়ের কি হবে ?

- আমার রুমি ভাই বলছিস কেন ? আমি তো কিছু বলিনি । মাও কথা দেয়নি ।

সোমা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,

আরো একটু ভেবে দেখ । রুমি পাত্র হিসেবে ভাল, আমেরিকার ইন্জিনিয়ার । তবে আমাদের মিশকাতও খারাপ কি ? চল, সেলিব্রেট করি । আমাকে চটপটি খাওয়া । ইউনিভার্সিটি গিয়ে চটপটি খাব ।

যেমনি মনে হওয়া, তেমনি ঝাপিয়ে পড়া । আমাদের গাড়ি ছুটে চললো ইউনিভার্সিটির দিকে । আমি হালকা বোধ করতে লাগলাম কারণ সোমাকে সব বলতে পেরেছি ।

।। ১৪ ।।

ফিন্যান্স এ্যালুমনি

আজ আমাদের ডিপার্টমেন্টের ফিন্যান্স এ্যালুমনি । অনেক নামি-দামি লোকজন এসেছে । হোটেল রেডিসনে এ্যালুমনির ব্যবস্থা করেছে ওরা । প্রথমে আলাপ-আলোচনা দিয়ে শুরু । তারপর ডিনার হয়ে শেষ ।

আমি সন্ধ্যে সাতটায় পৌছে গেলাম রেডিসনে । গিয়ে দেখি সোমারা আগেই চলে এসেছে । হাসি, কনা, মিলা, নাতাশা ওদের সাথে দেখা হলো । মিশকাতকে দেখলাম না কোথাও । আজ কদিন হলো মিশকাত আমাকে এড়িয়ে চলে । ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে বসে যেন আমার সাথে দেখা না হয় । একদিন করিডর দিয়ে হাঁটছি । দেখি ছেলেটা আসছে ওদিক থেকে । আমাকে দেখে অন্য করিডরে সরে গেল । আমাকে চিঠি লেখবার পর থেকে শরমে মরে গেছে ছেলোটা । না আমার সাথে কথা বলেতে পারছে, না আমার সামনে দাঁড়াতে পারছে ।

শুধু শুধু মিশকাতের কথা বলে লাভ কি ? আমারও একি অবস্থা । ওকে দেখলে আমারও অস্বস্তি লাগে । যেমন, গতকাল দেখলাম মিশকাত আসছে ওদিক থেকে । সাই করে আমি অন্য বারান্দায় ঢুকে গেলাম যেন ওর সাথে দেখা না হয় । অন্য বারান্দায় ঢুকেই আমার খুব হাসি পেল । একটা রুমে ঢুকে অনেকক্ষণ হাসলাম । আমাদের লুকোচুড়ি চলছে মাস খানেক হলো এবং জানিনা এর শেষ কবে । তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিৎ হয়েছি, আমাদের কাছাকাছি আসতে শেষমেষ খুব একটা দেরি হবে না । এখন শুধু সময়ের ব্যাপার ।

সোমা হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো, রুশা, এদিকে আয়, কথা আছে ।

আমি পড়িমরি করে ওর পিছু নিলাম । আমরা চলে এসেছি হল ঘরের পেছনে ।

সোমা বলতে লাগলো, তুই মিশকাতের কথা বলার পর থেকে আমি একটা খবরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম । গতকালি ব্যাপারটা নিশ্চিৎ হয়েছি ।

ধীরে ধীরে বললাম, খবরটা কি ?

সোমা আমার কথার উত্তর না দিয়ে তিনটে ছবি বাড়িয়ে দিল । দেখলাম, মিশকাত আর একটি মেয়ের ছবি । একটিতে মিশকাত পেছন থেকে মেয়েটিকে জড়িয়ে আছে, অন্যটিতে, মেয়েটার দুই হাত মিশকাতের উপরে । আরেকটিতে, মিশকাত আর মেয়েটা পাশাপাশি বসেছে ঘনিষ্ঠ হয়ে ।

সোমা বলতে লাগলো,

মেয়েটা আমার দূর-সম্পর্কীয় খালাতো বোন । ওর কাছ থেকে ব্যাপারটা নিশ্চিৎ হই । এক বছর হলো ওদের সম্পর্ক । ওদের পরিবারও ব্যাপারটা জানে । ওর নাম রমা, বদরুন্নেসা কলেজে পড়ে ।

আমি চুপ হয়ে গেছি ।

আমি কথা বলছি না দেখে সোমা বললো, কথা বলছিস না ?

অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, কি বলবো ?

- যা ইচ্ছে বল ।
- আমি কিছুই বলবো না, এই বলে হাঁটা দিলাম ।
- কৈ যাচ্ছিস ?
- বাড়ি ।
- ডিনার করবি না ?
- না, এই বলে হাঁটা দিলাম ।

।। ১৫ ।।

নূতন জীবন

মাকে এসে বললাম, আমি আমেরিকা পড়তে যাব ।

মা খুশি হয়ে গেলেন । বললেন, রোকেয়াকে বললে সব ব্যবস্থা করবে । হঠাৎ মেয়ের সুমতি ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, আজ-হোক, কাল-হোক বাইরে পড়তেই যাব, তাই আগে যাওয়াই ভাল ।

মা আবারও খুশি হয়ে গেলেন । বললো, ঠিক বলছিস তো ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

মা বললেন, আজি তোর রোকেয়া খালার সাথে কথা বলবো ।

মাস খানেক পরের কথা । ক্লাস সেরে বাসায় ফিরছি । লাইব্রেরির সামনে দেখলাম মিশকাত হেঁটে গেল । তারপর ফিরে এসে দাঁড়ালো । দীর্ঘ তিন মাস পর আমার সামনে এলো মিশকাত ।

আমি বললাম, কিছু বলবেন ?

- না কিছু না, এই বলে চলে যাচ্ছিল । তারপর ফিরে এসে বললো, শুনলাম আপনি আমেরিকা যাচ্ছেন পড়তে ?

- ইয়েস ।

- যাওয়াটা কি ঠিক হয়ে গেছে ?

আমি বললাম, কেন, আপনার কোন অসুবিধে আছে ?

মিশকাত মাথা নিচু করে ফেলেছে । তারপর বললো, আপনার কি কোন সমস্যা হচ্ছে এখানে ?

এবার মেজাজ চড়ে গেল আমার । জোড়ে জোড়ে বলে উঠলাম,

আমার সমস্যা হলে সেটা আমার ব্যাপার । আপনাকে ভাবতে হবে না, এই বলে হন-হন করে হাঁটা দিলাম ।

রোকেয়া হলের সামনে এসে দেখলাম একটা রিকসা যাচ্ছে । রিকশা থামিয়ে উঠে পড়লাম । বললাম, সিদ্ধেশ্বরী যান ।

রিকশা ছেড়ে দিল । আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম মিশকাত লাইব্রেরির সামনে দাড়িয়ে আছে হা করে ।

রিকসা চলতে শুরু করেছে । দেখতে দেখতে কাকরাইল মসজিদ চলে এলো । এখন বায়ে মোড় নিলেই সিদ্ধেশ্বরী । একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো আমার পাশে । দেখলাম মা গাড়ির জানালা তুলে ডাকছে ।

আমি রিকশা থেকে নেমে গাড়িতে উঠে বসলাম ।

আমাকে দেখে মা বললো, কি হয়েছে, কাঁদছিস কেন ?

- কৈ না তো ? এই বলে মুখে হাত দিয়ে দেখি চোখের পানিতে ভিজে গেছে সারা মুখ ।

তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে মুছে বললাম, কৈ থেকে এলো এত পানি ?

মা কিছু বলতে নিয়ে বললেন না । চুপ করে গেছেন আমাদের মা ।

।। ১৬ ।।

সুদূরে

আমেরিকা । বাকিংহাম রাস্তা দিয়ে হাঁটা দিয়েছি । গন্তব্য ইস্ট-ওয়েস্ট ড্রাইভ । ওখানে আমরা বাড়ি করেছি । বাড়ির পেছনে সুইমিং পুল, নীল সবুজ পানিতে ভরা । ডান দিকে ঝর্ণা । নিরন্তর পানি খেলছে সেখানে । একবার ফনা তোলে । আবার নিমিষেই গড়িয়ে যায় ।

ঘড়িতে দেখলাম বিকেল ছটা । অফিস সেরে বেরিয়েছি । আজ বছর তিনেক হলো ব্যাংকে চাকরি নিয়েছি । আমার ব্যাংক থেকে আমার বাসা দশ মিনিটের হাঁটা পথ । আমি ইচ্ছে করে বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে যাই । এর কারণ হলো ওক গাছ । বড় বড় ওক দাঁড়িয়ে আছে সারা পথ জুড়ে । আমি যখন হেঁটে যাই, তখন মচ-মচ শব্দে পাতা ভেঙে পড়ে । আর এই পাতা ভাঙার শব্দ শুনতেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ।

ইচ্ছে করে গাড়ি নেই না । হেঁটে যেতেই বেশি ভাল লাগে । ফলে এ মহল্লার লোকজন আমাকে চিনে ফেলেছে । ঐ যে ব্যাংক অফিসার যাচ্ছে । আমি হাঁটতে গেলে বাচ্চারা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় । তবে যেদিন বৃষ্টি-বাদলা থাকে, সেদিন গাড়ি নিতেই হয় ।

রুমি আমার সুবিধে মাথায় রেখে আমার ব্যাংক লাগোয়া বাড়ি কিনেছে যেন অনায়েসে অফিস যেতে পারি । কিন্তু আমার সুবিধে করতে গিয়ে ওকে আসুবিধেয় পড়তে হয়েছে অনেকগুণ । ওর অফিস অনেক দূরে । সেই সাত সকালে বেরিয়ে পড়তে হয় । ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে । কিন্তু ফেরবার পথে আমার কাছে বার বার জানতে চাইবে, কিছু আনতে হবে কিনা, আজ রাতে বাইরে খাব কিনা, কোনো সিনেমা দেখা যায় কিনা ।

আমি বলি, কিছু লাগবে না । ফ্রিজ ভরা খাবার ।

- তারপরেও কিছু লাগলে বলো ?

আমি হেসে বলি, আমার কিছু লাগবে না । তুমি তাড়াতাড়ি আসো ।

রুমি বলে, চলো না আজ বাইরে কোথাও খাই ?

- আজ না আশার রাতে স্কুলে প্রোগ্রাম ?

- প্রোগ্রাম শেষ করে না হয় গেলাম ।

আমি বললাম, সে তো অনেক রাত হয়ে যাবে ।

- হলে অসুবিধে কোথায় ? কাল তো ছুটি-ছাটা ।

আমি চুপ হয়ে আছি দেখে রুমি বলে, কি কথা বলছো না যে ?

- আগে বাসায় আসো, তারপর দেখি ।

- ঠিক আছে, এই বলে রুমি মোবাইল রেখে দেয় ।

আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ সাত বছর । এই সাত বছরে রুমির পীড়াপিড়িতে কত যে বাইরে খেয়েছি, তার ইয়াত্তা নেই । ছেলেরা যে এত বাইরে খেতে পছন্দ করে, সেটা আমার জানা ছিল । আমার ধারণা ছিল, হাসবেন্ডরা মুখ গম্ভীর করে বাসায় ফিরবে । বলবে, খানা লাগাও । আমি চট-জলদি খানা বেড়ে দেব তারপর খেয়ে-দেয়ে লম্বা ঘুম দেবে কারণ কাল সকাল-সকাল অফিস ।

রুমি তার উল্টো । কিভাবে ছুটি বের করা যায়, কি করে এদিক-ওদিক যাওয়া যায়, এ নিয়ে তার ব্যস্ততা । গত সাত বছরে আমরা আলাস্কা গিয়েছি তিন বার, ইউরোপে পাঁচ বার, কানাডাতে ছয় বার । আশেপাশে বহু জায়গায় যাওয়া পড়েছে । রুমির খুব ইচ্ছে লং ড্রাইভ করবার, গাড়ি চালিয়ে সারা আমেরিকা চষে বেড়াবে কিন্তু আমার জন্য পারে না । ঘন্টার পর ঘন্টা হাইয়ে মাড়াতে আমার ভাল লাগে না । তারপরেও রুমির ইচ্ছে রাখতে আশেপাশের স্টেটগুলোতে গিয়েছি । যে ছেলেটা আমার জন্য সব করতে পারে, তার জন্য আমার অনেক করণীয় থাকবার কথা । বাবা-মার কাছে যে যত্ন-আত্মি পেয়েছি, এখানে তার ঘাটতি আছে বলে কখনো মনে হয়নি । তবে রুমির সব ইচ্ছের সাথে আমাদের মেয়ে আশার সব সময়ে সায় আছে । আশা তার বাবার মতন হয়েছে । বাইরে ঘুরতে, খেতে, হাঁটতে পছন্দ করে । এ বছর ক্লাস থ্রি তে উঠলো মেয়েটা ।

।।১৭ ।।

আশা

আমাদের মেয়ের নাম আশা, সে কথা তো আগেই বলেছি । আমাদের বাড়ির সাথেই আশার স্কুল । একটু হাঁটলে স্কুল চলে আসে । আশার সব কাজের মধ্যে একটা হলো, ছবি আঁকা । আমার বাড়ির পাশ দিয়ে খাল বয়ে গেছে, যাকে ক্রিক বলে এদেশে । আশা সেখানে ছবি আঁকে ।

একদিন এসে বললো, দেখতো কেমন এঁকেছি ?

আমি বললাম, কি একেছিস ?

- আমাদের বাড়ির পেছনের খাল । আচ্ছা মা, এই খাল দিয়ে সমুদ্রে যাওয়া যায় ?

- না । এটা খুব ছোট । একটু গিয়ে থেমে গেছে । কেন, তুই খাল দিয়ে সমুদ্রে যেতে চাস ?

- ইয়েস, এক্সাক্টলি তাই, বলে মাথা নাড়লো আশা ।

আমি বললাম, ঠিক আছে, সে রকম একটা খাল খুঁজে বের করতে হবে যেটা সমুদ্রে পড়েছে । তোর বাবাকে বলিস খুঁজে বের করতে ।

- তাহলে কালি চল না খুঁজে বের করি ?

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

- দেখো আরো একটা ছবি ?

- কৈ দেখি ?

আশা বাড়িয়ে দিল । দেখলাম বড় করে গোলাপ আঁকা ।

আমি বললাম, এটা কিসের ছবি ?

- খোদার ।

- খোদার আবার ছবি হয় নাকি ?

- হয় এবং এটাই সেটা ।

আমি বললাম, খোদা ফুল হতে যাবে কেন ?

- কারণ খোদা খুব সুন্দর । তাই ফুল আর খোদা একি ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

আশার বয়স এখন কতই হবে । গত মাসে সাতে পড়ল কিন্তু বয়সের তুলনায় ওর কৌতুহলের শেষ নেই । সব কিছু জানা চাই ওর । ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি ।

একদিন এসে বললো, খোদা তো আকাশে থাকেন । প্লেনে উঠলে দেখিনা কেন ?

আমি বললাম, কে বলেছে খোদা আকাশে থাকে ?

- কেন, খোদার কথা বললে সবাই আকাশে তাকায় ?

- ইয়েস কারণ আশেপাশে তাকে দেখা যায় না, তাই ভাবে আকাশেই বুঝি পাওয়া যাবে ।

- তাহলে খোদা কোথায় থাকে ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, এর উত্তর কেউ জানে না ।

সাথে সাথে ছবি বললো, আমি জানি, এই বলে একটা ছবি মেলে ধরলো ।

আমি দেখলাম, চাঁদের ছবি একেঁছে আশা । আর তার পাশেই একটা সাদা গোলাপ ।

আমি বললাম, সাদা গোলাপ কেন ? তাও চাঁদের পাশে ?

- সাদা গোলাপ মানেই খোদা । আর খোদা তো চাঁদের পাশেই থাকবে ।

আমি বললাম, সাদা গোলাপ কেন ? লাল গোলাপ না কেন ?

- সাদা রঙটাই যে সবচেয়ে সুন্দর, এই বলে আশা হেসে দিল ।

একটু পরে শুনলাম ফোন বাজছে । ফোন ধরতেই ওপার থেকে একটা ছেলের গলা । বললো, আমি আরিফ । রুশা ম্যাডামের সাথে কথা বলতে চাই ।

আমি বললাম, আমি রুশা ।

- স্যালামোলায়কুম ম্যাডাম, আমার চাকরির ইন্টারভিউ পড়েছে আপনাদের ব্যাংকে । একটু জানতে চাচ্ছি, কি কি প্রশ্ন ওরা সাধারণত করে ইন্টারভিউর সময়ে ?

আমি বললাম, আপনি কি কাল অফিসে আসতে পারবেন ?

- হ্যা পারবো ।

- দশটায় আসুন । তখন কথা হবে ।

- আচ্ছা, বলে ফোন রেখে দিল ছেলেটা ।

আশা এসে বললো, কে ফোন করেছে ?

- একটা ছেলে ।

- কি বলে ?

- না, কিছু না । কালকে তোমার স্কুল বন্ধ । বাসায় কি করবে ? আমার তো অফিস আছে ।

- ভাবছি সারাদিন ছবি আঁকবো ।

- তোমাকে একটা সাজেশন দেই ?

আশা ঘাড় নেড়ে সায় দিলো ।

- এবার তোমার বাবার ছবি আঁক । সামনে ওর জন্মদিন । বড় করে ছবি আঁকবা ওকে সারপ্রাইজ দেবার জন্য, কি বলো ?

আশা লাফিয়ে উঠলো । বললো, ইউ আর রিয়েলি জিনিয়াস ।

পরদিন সকাল দশটায় ছেলেটা এলো । বয়েস বিশ-বাইশ হবে । সবে মাত্র পাশ করেছে বলে মনে হলো ।

আমি বললাম, আপনি গতকাল ফোন করেছিলেন ?

ছেলেটা মাথা নাড়লো ।

আমি বললাম, বসুন ।

ছেলেটা বসে পড়লো আমার সামনের চেয়ারে ।

- কি পদের জন্য ইন্টারভিউ ?

- ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি ।

- কবে ইন্টারভিউর ডেট পড়েছে ?

- সামনের সপ্তাহে ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

সাধারণত ওরা আমেরিকার অর্থনৌতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চায় । কিছু প্রশ্ন থাকে সেন্ট্রাল ব্যাংক নিয়ে । কিভাবে সেন্ট্রাল ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করে । মার্কিন ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য দেশের বাংকিংক ব্যবস্থার পার্থক্য কি কি? এসব এজন্য বলছি, আমাকে এসবি জিঙাসা করা হয়েছিল ।

ছেলেটা বললো, ঠিক কতগুলো প্রশ্ন করে মোটামুটি ?

- তা ধরেন, বিশ-ত্রিশটার নিচে না । ঘন্টা দেড়েক চলে ইন্টারভিউ । আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন ?

- ইউটি থেকে মানেজমেন্টে ব্যাচেলার করেছি ।

- আমার ঠিকানা পেলেন কোথায় ?

- ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপনার সন্ধান পাই ।।

- কফি খাবেন ?

ছেলেটা মাথা নাড়লো ।

আমি কফি এনে দিলাম । নিজেও নিলাম এক কাপ ।

কফি খেতে খেতে খেয়াল করলাম, ছেলেটার সার্টের উপরের কটা বোতাম খোলা । হঠাৎ কি হলো, বুঝলাম না । রীতিমত খেপে গেলাম । জোড়ে জোড়ে বলে উঠলাম,

আরিফ সাহেব, আপনার সার্টের বোতাম কিন্তু খোলা । প্রশ্নের উত্তর দিলেই তো হলো না । আপনার পোশাকটাও ইমপোর্ট্যেন । সার্টের বোতাম খুলে যারা ঘুরে বেড়ান, তাদের চাকরি হয় না এই ব্যাংকে ।

কথাগুলো বলেই বুঝলাম, এসব আমি কি বলছি ? তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটার মুখ হা হয়ে গেছে । ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে । নিজেকে সামলে নিলাম । বললাম, কিছু মনে করবেন না । একটু বসুন ।

আমি রেস্টরুমে চলে এসেছি । তারপর মুখে পানি ছিটিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম ।

আমি ফিরে গেলে ছেলেটা বললো, ম্যাডাম, আমি খুব সরি । সার্টের বোতাম খুলে ঘুরে বেড়ানো আমার উচিত হয়নি । এ ভুল আর হবে না ।

আমি উঠে গিয়ে আরিফের জন্য কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে এলাম । বললাম, নিন, আমার ফেবারেট ব্র্যান্ড । আমার ধারণা আপনাকে ওরা নেবে কারণ আপনার বয়স কম । তাছাড়া ভাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন । এখন ইন্টারভিউটা ভাল হলে ভয় দেখছি না । কাল আরেকবার আসুন । আমার কাছে ইন্টারভিউর ভাল বই আছে । আপনাকে দিতে পারবো ।

- ঠিক আছে, কাল আসবো ।
- আসুন, এই বলে হেসে দিলাম ।

আমার প্রসস্ত হাসি দেখে ছেলেটা আস্বস্ত হলো । তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ।

।।১৮ ।।

আমার ভাই বাবলু

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো । ফোন ধরতেই মার গলা ।

মা বললো, কেমন আছিস ?

- ভাল । এই মাত্র অফিস থেকে ফিরলাম ।

- রুমি আর আশা ?

- ওরা ভাল আছে । তোমাদের জামাইতো এক্সাইটেড । ওর প্রমোসন হবে আগামী মাসে । এখন থেকেই প্ল্যান করছে কোন কোন স্টেটে ঘুরতে যাবে ।

মা হেসে দিলেন । বললেন, রুমিকে দোয়া দিস । বলিস, প্রমোসনের মিস্টি পাঠাতে ।

- আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মিস্টি পাঠাবো ?

- তাই পাঠাস । প্রমোসনের মিস্টি খেতে হবে । দেখতো, বাবলু কি কান্ড করেছে ?

আমি বললাম, কি ?

- হঠাৎ একটা মেয়ে এনে বলে, এ তোমার বউ ।

আমি বললাম, কি বললা । আবার বলো ।

মা বলতে লাগলেন,

বাবলু একটা মেয়েকে বাসায় এনে বলে, এ তোমাদের বউ । তোর বাবা তো রেগে আগুন । কারো সাথে কথা বলছে না সকাল থেকে ।

মার কথা শুনে আমি চুপ করে গেলাম ।

আমি কথা বলছি না দেখে মা বললো, এখন কি করি ? মেয়ে পক্ষ কিডন্যাপের মামলা না দিলে হয় । কথা বলছিস না কেন ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

সবচেয়ে ভাল হয়, বউকে ঘরে তুলে নাও । হয়তো রাগ করে বউ ঘরে তুললা না । কিন্তু কদিন পরে যখন রাগ ভাঙবে, তখন ঘরে তোলবার জন্য দৌড়াদুড়ি করবা । তারচেয়ে এখনি তুলে নেও । কি নাম মেয়ের ?

- কমু । বাবলুর সমানি বয়েস । ইডেনে পড়ে ।

আমি বললাম, এমন কি হলো যে পালিয়ে বিয়ে করতে হলো ?

- সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন ? ওদের কি মনে হয়েছে, বিয়ে করেছে । বাবলুর সাথে কোন মেয়ের সম্পর্ক আছে, সেটা জানলাম বিয়ের পরে ।

আমি বললাম, এখন বাবাকে বুঝিয়ে রাজি কর । তারপর মেয়ের বাড়িতে খবর দাও । ওরাও তো মেয়ে খুঁজছে ।

মা চুপ হয়ে গেলেন, বললেন, ঠিক বলছিস তো ?

- ইয়েস, ঠিক বলছি, কথাটা জোড় দিয়ে বললাম ।

মা আবারো চুপ ।

- আর একটা কাজ করো । ফুলি খালাকে ডেকে আন । খালা এসে বউকে দেখাশোনা করুক ।

- তোর খালা সকাল থেকে বউ নিয়ে বসে আছে ।

আমি বললাম, ফুলি খালাকে দাও । কথা বলি ।

- ধর দিচ্ছি ।

ফুলি খালা এসে ফোন ধরলেন, কি রুশা । কেমন আছিস ?

- ভাল । তুমি ?

- আমি ভাল ।

- কেমন দেখলা মেয়েটাকে ? মা তো খুব ভয় পাচ্ছে ।

খালা হেসে বললেন, দারুণ একটা মেয়ে । আমার সাথে অনেক গল্প করছে ।

আমি বললাম, তোমার কাছে কে না দারুণ ?

খালা চুপ হয়ে গেল । বললো, নারে, মেয়েটা আসলেই ভাল । এ ব্যাপারটা আমি ম্যানেজ করছি । তোর চিন্তা করতে হবে না ।

একটু থেমে খালা বললো, আশা, কেমন আছে ?

- ভাল ।

- আশা আছে আশেপাশে ? একটু কথা বলতাম ?

- না এখনো ফেরেনি । ওদের আজ সকুলে প্রোগাম । রুমির সাথে ফিরবে ।

- তুমি দেশে আসবা না এ বছর ?

- দেখি ।

- রুশা ।

- বলো খালা ?

- রুমি কেমন আছে ?

- ভাল ।

- শুনলাম, আশা নাকি মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে ?

- হ্যাঁ দেখে ।

- কেন ?

আমি হেসে বললাম, ও দিনরাত এটা-সেটা ভাবে । তাই হাবিজাবি স্বপ্ন দেখে । এত ভাবুক মেয়ে নিয়ে আমি বিপদে আছি ।

খালা বলে উঠলেন, আমার একটা কথা রাখবা ?

- বলো ।

- আমি তাবিজ পাঠাবো । নারায়নগন্জ হুজুরের দেয়া । তাবিজটা গলায় পড়িয়ে দিবা । দেখবা আশার ভাল ঘুম হচ্ছে ।

আমি বললাম, ওর তো কোন অসুখ নেই । তাবিজের কথা বলছো কেন ? ও শুধু হাবি-জাবি ভাবে আর হাজারো প্রশ্ন করে ।

খালা সাথে সাথে বললেন,

ওটাই তো বড় অসুখ । এটুকুন বাচ্চা এত ভাববে কেন ? খোদার কালাম সহিহ ভাবে লেখা আছে তাবিজে । তুই আপত্তি করিস না ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । বললাম, ওকে তাবিজ পড়াতে আমাকে হাজার হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ।

- যেমন ?

আমি বলতে লাগলাম,

আশা জানতে চাইবে, তাবিজে কি কি লেখা আছে ? যদি বলি, দোয়া লেখা আছে । তখন জানতে চাইবে, দোয়াগুলো কিভাবে লেখা হয়েছে ? পেন্সিলে না কালিতে ? তাবিজ পড়লে কি হয় ? না পড়লে অসুবিধে কোথায় ?

খালা হেসে দিলেন । বললেন, জবাব না হয় দিলা ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, ঠিক আছে । তুমি তাবিজ পাঠিও । আর তাবিজের সাথে সব তথ্য দিও যেন আমি জবাব দিতে পারি ।

- ঠিক আছে । আমি সব লেখে পাঠাবো ।

আমি বললাম, খালা, এখন রাখি । বাইরে কে যেন এসেছে । পরে কথা হবে ।

খালা বলে উঠলেন, ঠিক আছে, শোন, একটা কথা ।

- বলো ।

- তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে ।

।। ১৯ ।।

রাশু শাড়ি খানা

ফুলি খালাকে আমি টাকা দিয়েছি । সে টাকায় ফুলি খালা দোকান নিয়েছে গুলিস্তানে । এখন আর খালাকে শাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয় না । আগে যেমন দোকানে-দোকানে, বাসা-বাড়িতে শাড়ী সাপ্লাই দিত । এখন সেসব করতে হয় না । এখন ক্রেতারা খালার দোকানে আসে শাড়ি নিতে । তবে ফুলি খালা দোকান দিলেও ফুলি খালাদের দল এখনো আছে । খালার মতন অনেক মেয়ে আসে শাড়ি সাপ্লাই দিতে । খালা জানে ওদের কথা, তাই সহজ শর্তে শাড়ি রাখে আর লাভ দিয়ে বিক্রি করে দেয় । কদিন আগেই তো খালা ছিল ওদের দলে ।

সব মিলিয়ে খালার দোকান ভাল চলে । দিনে বিশ হাজার টাকার বিক্রি হয় । সেই টাকা দিয়ে খালা পাশের দোকানটাও নিয়েছে । এখন দোকানের সাইজ প্রায় ডবল । দুজন কর্মচারি রেখেছে । ওরা খালার ব্যবসা দেখাশুনা করে । খালার অভাব ঘুচেছে এখন ।

খালা তার দোকানের নাম দিয়েছে, রুশা শাড়ি খানা । আমাকে একদিন ফোন করে বললো, রুশা শাড়ি খানা, নামটা কেমন ?

আমি বললাম, পাগলামি করবা না । এসব আমার পছন্দ না ।

খালা হেসে বললেন, তুমি রেগে যাচ্ছিস কেন ? এ দোকান তো তোর । মালিকের নামে নাম দিয়েছি ।

আমি বললাম, তুমি আমার নাম দিলে আমি কথা বলবো না ।

ফুলি খালা হেসে বললেন, ঠিক আছে কথা বলিস না । তুই কথা না বললেও আমি বলবো ।

আমি হেসে দিলাম । বললাম,

তুমি সব পার খালা । শত শত মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়েছো শাড়ি মাথায় নিয়ে । ঘরে অসুস্থ্য স্বামি, শ্বশুর-শাশুড়ি শয্যাগত । কৈ, তোমাকে তো কখনো কমপ্লেইন করতে শুনিনি ?

খালা হেসে দিলেন । কিছু বললেন না ।

আমি বললাম, ফুলি খালা ।

- বলো ।

- আমার মেয়ে যেন তোমার মতন হয় ।

খালা আবারও হেসে দিলেন ।

আমি বললাম, তোমার যে পেটে ব্যথা হতো, তার কি অবস্থা ?

- তোর দোকানের টাকা দিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছি । ডাক্তার বলেছে কিছুই হয়নি । বেশি হাঁটলে এ রকম হয় । রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে ।

আমি রেগে বললাম, তোমাকে বলেছি কখনো বলবে না, এটা আমার দোকান । এ দোকান তোমার, তোমার ছেলে-পুলেদের ।

- তুইও তো আমার ছেলে-পুলে, খালা বলে উঠলেন ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না ।

খালা বলতে লাগলেন,

তবে শোন, তোর খালুকে ভাল ডাক্তার দেখিয়েছি । এখন ওর ফিজিওথেরাপি চলছে । ফলে অবশ ভাবটা অনেক কমে গেছে । এখন বেশ হাঁটতে পারে ।

আমি বললাম, তুমি নিশ্চয় খুশি ?

খালা চুপ হয়ে গেছে । বুঝলাম খালা কাঁদছে ।

খালা বলতে লাগলেন, ডাক্তার বলেছে, বছর খানেক পরে হয়তো পুরোই সুস্থ্য হয়ে যাবে ।

- তাহলে খালুকে নিয়ে আমেরিকা ঘুরে যাও । আমি কাগজ-পত্র পাঠাবো ।

খালা খুশি হয়ে বললেন, তোর বাড়ি-ঘর দেখতে একবার যাবই । আমি গিয়ে সব সাজিয়ে আসবো ।

আমি হেসে বললাম, তুমি কি সাজাবা ? তোমাদের জামাই ঘর-বাড়ি সাজিয়ে টাইটুম্বুর করে রাখে । আমাকে কিছুই করতে দেয় না ।

খালা হেসে বললেন, রুমি আসলেই ভাল । তাই আল্লাহ ওকে সবচেয়ে ভাল মেয়েটা দিয়েছে ।

- তুমি ভাগ্য মান খালা ?

সাথে সাথে খালা বললেন,

মানুষ যে কাজেই হাত দিক, প্রথমে ভাগ্যটা এসে দাঁড়ায় । তুই হয়তো বায়ে যাবি, কিন্তু খোদা চাইছেন ডানে, তখন ডানেই যেতে হবে ।

আমি উত্তর দিতে গিয়ে চুপ হয়ে গেলাম ।

খালা বললেন, কি চুপ হয়ে গেলি ?

- না এমনি । আজ এ পর্যন্তই । আমি যাচ্ছি আশার স্কুলে । তোমার সাথে পরে কথা হবে ।

- ঠিক আছে, যা । আর একটা কথা ।

- বলো ।

- তোর বন্ধু সোমা কোথায় ?

- বাংলাদেশে ।

- কি করে ?

- একটা বিদেশী এনজিও তে চাকরি করে ।

- তোর সাথে কথা হয় ?

- হু, মাঝে-সাঝে । তবে অনেক দিন হলো লাপাত্তা ।

- সোমার সাথে কথা হলে আমার কথা বলিস ।

- হঠাৎ সোমার কথা জানতে চাইছো কেন ?

খালা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, ও যে গুলির মধ্যে ঝাপ দিয়ে তোকে টেনে তুলেছিল, সেই কথাটা মাঝে-মাঝে মনে পড়ে ।

নূতন খবর

আজ ছুটি-ছাটা । ভাবছি সারাদিন শুয়ে-বসে কাটাবো । সন্ধ্যের দিকে আশাকে নিয়ে বের হবো মেলা দেখতে ।

আশা বললো, আজ কোথায় যাব ?

- মেলা দেখতে ।

- কোথায় ?

- গারল্যান্ডে ।

আশা খুশি হয়ে গেল । বললো, মেলা দেখে আমরা Tutifruti খেতে পারি ?

- হ্যাঁ পার, বলে হেসে দিলাম ।

আশার প্রিয় Trutifuti । Trutifruti হলো আইসক্রিম, খুব মজা । আশা আর রুমি সুযোগ পেলে Trutifuti খেতে বসে । তবে রুমির জন্য ভাল না এত আইসক্রিম খাওয়া কিন্তু ওসবের ধার ধারে না ও । আমি আপত্তি করলে তখনকার জন্য বন্ধ রাখে । তারপর কদিন গেলেই আবার শুরু করে । আইসক্রিম খেয়ে কে কবে মারা গেছে, বলো ? এই বলে রুমি খেতে শুরু করে ।

সন্ধ্যের দিকে তৈরি হচ্ছি আশাকে নিয়ে বের হবো । তখন দরজায় বেল বাজলো । ঘড়িতে দেখলাম সন্ধ্যে সাতটা । এ সময়ে কারও আসবার কথা না । আসলে রুমি আসবে, কিন্তু ও'তো গেছে অন্য শহরে । ফিরতে দেরি হবে ।

ডোর-পিপে তাকিয়ে দেখি এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছে । বাঙালী স্টাইলে শাড়ি পড়েছে । চেহারাটা খুব পরিচিত মনে হলো ।

দরজা খুলতেই দেখি সোমা দাঁড়িয়ে আছে ।

আমি গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ।

- বললাম, কৈ থেকে উদয় হলি ? ভেতরে আয় ।

সোমা গিয়ে সোফায় বসলো । বললো,

নিউ-ইয়র্কে এসেছিলাম অফিসের কাজে । তোকে জানাইনি ইচ্ছে করে, সারপ্রাইজ দেবো বলে । হঠাৎ চলে আসবার জন্য ক্ষমা চাইছি ।

আমি বললাম, তুই মনে হয় খুব ফর্মালিটি শিখেছিস এই ক'বছরে ? ন্যাকামি করবি না । তোর লাগেজ কোথায় ?

- হোটেলে ।

- চল, নিয়ে আসি ।

সোমা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, এর পরে তোর বাসায় উঠবো । আমার কাল ভোরে ফ্লাইট । তোর সাথে গল্প করে রাতেই ফিরে যাব ।

আমি সাথে সাথে বললাম, একদম চুপ । কথা বলবি না । তোকে আমি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব ।

দেখলাম সোমা অন্যমনস্ক । আমার কথা আমলে আনছে না ।

আমি বললাম,

তোর শাস্তি হওয়া উচিত । এতদিন হলো আমেরিকা এসেছিস অথচ ফোন করবার প্রয়োজন মনে করিস নি ।

সোমা হেসে দিল । কিছু বললো না ।

আমি বললাম, বিয়ে করেছিস ?

- না ।

- কেন ?

- ইচ্ছে হয়নি ।

- সেটা কি রকম ?

- সেটা বলতেই এসেছি ।

আমি বললাম, ঠিক আছে পরে বলিস । আগে কিছু খেয়ে নে ।

- খেতে ইচ্ছে করছে না । তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে ।

- সিরিয়াসনেস দেখাবি না । এখানে আরাম করে বস । তোকে স্পেসাল রান্না খাওয়াবো । আজ সকালে রেধেছি ।

- ঠিক আছে । তার আগে এক কাপ চা দে ।

আমি চা বানাতে লাগলাম । আমাদের বসার ঘরেই চা বানানোর ব্যবস্থা ।

- ক চামচ চিনি দেব ?

- এক চামচ ।

চা বানিয়ে সোমার সামনে দিলাম ।

বললাম, চিনি হয়েছে ?

সোমা মাথা নাড়লো ।

আমি বললাম, কত বছর পর দেখা ? তুই আমাকে ফোন করা বন্ধ করেছিস বছর খানেক হলো ।

মাথা নাড়লো সোমা ।

আমি বললাম, এখন চটপটি খাস না ?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললো, রুমি ভাই কোথায় ?

- ও বাইরে গেছে । ফিরতে দেরি হবে ।

- অল্পের জন্য দেখা হলো না । তোর বর খুব ভাল ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । বললাম, শতভাগ ।

- তোর চাকরি কেমন চলছে ?

- ঐ যে আমার আফিস । জানালা দিয়ে যেটুকুন দেখা যায়, দেখালাম সোমাকে । বললাম, দারুণ একটা চাকরি । সারাদিন কাস্টমার লেগে থাকে । ফলে কখন যে বেলা পরে আসে, বুঝতে পারি না । আচ্ছা তুই এখন চটপটি খাস না ?

আমার কথা শুনে সোমা একটু হাসলো । কিছু বললো না এবারও ।

সোমা বললো, তোর মেয়ে কোথায় ?

- পাশের বাড়ি গেছে । এখনি ফিরবে । ওখানে এক বাঙালি ফ্যামিলি থাকে । ওদের মেয়ে আছে, আশার সাথে পড়ে । আচ্ছা, তুই বিয়ে করছিস না কেন ? আমার কাছে ভাল পাত্র আছে । তোর মতন বিয়ে না করে বসে আছে ।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে সোমা বললো, তোর মিশকাতের কথা মনে পড়ে ?

আমি বললাম, হঠাৎ মিশকাত কেন ? ও চ্যাপ্টার তো অনেক আগেই শেষ ।

সোমা সাথে সাথে বললো, না, শেষ হয়নি । আমি জানি, তুই মিশকাতকে এখনো মিস করিস ।

আমি হেসে দিলাম । বললাম, তোকে বিস্কিট দেই ? চায়ের সাথে ভিজিয়ে খা । ভাল লাগবে ।

সোমা কিছু বললো না ।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, হঠাৎ মিশকাতকে আনছিস কেন এই অবেলায় ?

মিশকাতকে আনছি কারণ ওই শয়তানটার জন্যই সব এলোমেলো হয়ে গেছে ।

আমি বললাম, মিশকাতের জন্য সব এলোমেলো হবার কোন কারণ দেখি না । যে ছেলে এক সাথে একাধিক মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়, তার কথা ......

- তুই চুপ কর, সোমা ঝাঝিয়ে উঠলো ।

আমি থমকে গেলাম ওর গলার স্বরে ।

কিছুক্ষণ পরে বললো, আগ-বাড়িয়ে কথা বলবি না । আগে আমার কথা শোন ।

- ঠিক আছে, কি বলবি বল, আমি রাগ করেই বললাম কথাটা ।

সোমা বলতে লাগলো,

মিশকাতরা ছোটবেলা থেকে আমাদের পাড়াতে থাকতো, সে কথা তোকে বলেছি । তখন থেকে ওকে ভাল লাগতো কিন্তু কখনো বলা হয়নি । কিছুদিন পর মিশকাতরা অন্য পাড়ায় চলে যায়, ফলে যোগাযোগটা কাটা পড়ে । কিন্তু যখন ইউনিভার্সিটিতে আবার দেখা হলো, তখন ঠিক করলাম ওকে সব বলবো ।

আমি বললাম, বললি না কেন ?

- বলতাম কিন্তু তুই এসে দাঁড়ালি পথে । আর বলা হলো না ।

আমি বললাম,

কিন্তু তুই তো বলেছিস, মিশকাতের সাথে তোর খালাতের বোনের সম্পর্ক । ওদের ঘনিষ্ঠ ছবিও আমাকে দেখিয়েছিস । ওদের বিয়ে হয়নি ?

হেসে দিল সোমা । বললো, ওদের বিয়ে হয়নি এবং হবেও না কখনো ।

- সেটা কি রকম ?

সোমা চুপ হয়ে গেছে । মাথা নিচু করে ফেলেছে মেয়েটা ।

আমি বললাম, কি হলো, চুপ মেরে গেলি ?

আমার যে চুপ না হয়ে উপায় নেই, এই বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো মেয়েটা ।

হঠাৎ করে সোমাকে কাঁদতে দেখে আমি অপ্রস্তত হয়ে গেছি । কি করবো বুঝতে পারছি না । বললাম, কি হয়েছে তোর ?

মাথা নিচু করে সোমা বলতে লাগলো, ছবিতে যে মেয়েটা দেখেছিস, সেটা আমার খালাতো বোন । কিন্তু ওর পাশে বসা ছেলেটা মিশকাত না । ওটা আমার খালু ।

আমি বললাম, বুঝলাম না । আবার বল ।

সোমা ঝাঝিয়ে উঠলো, তুই আসলেই গাধা । সেজন্য সবাই তোকে ঠকায় ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ করে গেলাম ।

সোমা বলতে লাগলো,

যখন দেখলাম, তুই মিশকাতকে পছন্দ করতে শুরু করেছিস, তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না । যে মানুষটাকে আমি সারা-জীবন চেয়েছি, তাকে কিছুতেই হাত ছাড়া করবো না । আমি করলাম কি, আমার খালাতো বোনের কতগুলো ছবি যোগার করলাম, যেগুলো ওর বাবার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে তোলা । তারপর ভাল একটা স্টুডিওতে গিয়ে ওর বাবার জায়গায় মিশকাতকে বসিয়ে দিলাম । এমন ভাবে মিশকাতকে বসানো হয়েছে যে, কোথাও কোন ফাক রইলো না । জানিস তো এটা গ্রাফিকস আর এ্যানিমেশনের যুগ । তিলকে তাল বানানো যায় ।

আমি বললাম, দাঁড়া, একটু দাঁড়া । আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোর কথা । আমাকে একটু ভাবতে দে ।

আমি মাথা নিচু করে ফেলেছি ব্যাপারটা বোঝবার জন্য । তারপর অনেকক্ষণ পরে বললাম, তারমানে ঐ ছবিতে বসা ছেলেটা মিশকাত না এবং ঐ মেয়ের সাথে মিশকাতের কোন সম্পর্ক নেই ?

সাথে সাথে সোমা বলে উঠলো, মিশকাত তো ওকে চেনেই না । সম্পর্ক তো দূরের কথা ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । কোথায় যেন সুর কেটে গেল ।

সোমা বলতে লাগলো,

তোর সাথে ছাড়াছাড়ির পর আমি চেষ্টা করতে লাগলাম মিশকাতের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে, ওকে কাছে টানতে । এভাবে দশ বছর কেটে গেল । তারপর এক সময়ে বুঝলাম, ওর মন বাধা পড়ে গেছে তোর সাথে । সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না ।

সোমা উঠে দাঁড়িয়েছে । তারপর হাঁটতে হাঁটতে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো । বললো,

মেয়েরা হয়তো অনেক কিছুই পারে কিন্তু ভালবাসার মানুষকে শেয়ার করতে পারে না । তুই জানতে চাস না, মিশকাত এখন কোথায় ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

- মিশকাত এখন লন্ডনে । লন্ডনের একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় । বাবা-মাকে সাথে নিয়ে গেছে ।

আমি বললাম, ওর ছেলেপুলে কজন ?

- ও তো বিয়ে করেনি । সারাদিন পড়াশোনা নিয়ে কাটায় ।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, মিশকাতের জন্যই কি তুই বিয়ে করিসনি ?

- না, মিশকাতের জন্য নয় । যখন বুঝলাম, আমি অপরাধ করেছি, তখন ঠিক করলাম কখনো বিয়ে করবো না । তোর মতন নিস্পাপ মেয়েকে কস্ট দেবার শাস্তি সারাজীবন বয়ে বেড়াবো ।

সন্ধ্যে নেমেছে অনেকক্ষণ । আমাদের কারো খেয়াল নেই । আমরা কেউ বাতি জ্বালাতে উঠিনি । দুজনেই চুপ হয়ে বসে আছি ।

হঠাৎ আশা এসে ঘরে ঢুকলো । বললো, মা বাতি দাওনি, কেন ?

আমার সম্বিৎ ফিরে এলো । বললাম, বাতি দাও ।

আশা গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দিল । বাতির আলোতে দেখলাম সোমা আমার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল-ফ্যাল করে ।

বললাম, তুই একটু বস ।

আমি আমার ঘরে চলে এসেছি । তারপর দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম । বারান্দার লাইট অফ করতেই অন্ধকার নেমে এলো । বারান্দায় সব সময়ে একটা ইজি চেয়ার পাতা থাকে । সেখানে গা এলিয়ে দিয়েছি । মুহুর্তেই শত-সহস্র তারকারা সামনে এসে দাঁড়ালো । মনে এসে ভর করলো দশ বছর আগের কথা । ঝাকে ঝাকে গুলি উড়ে যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে আর সেই গুলি ভেদ করে একটা মেয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে ।

।। ২১ ।।

আবার সেই বৃত্তে

অফিস ছুটি হয়েছে কেবলি । ঘড়ির কাটা সন্ধ্যে ছটা ছুয়েছে । দেরি না করে বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছি । দশ মিনিট হাঁটলেই আমার বাসা ।

অফিস থেকে বের হতেই ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে পড়তে লাগলো । শীত পড়তে শুরু করেছে সারা আমেরিকা জুড়ে । কদিন পরে ঝির ঝির করে বরফ নেমে আসবে ।

আমার বাড়ি ফেরবার রাস্তাটা আবাসিক এলাকার মধ্য দিয়ে । সারি সারি ওক গাছ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে । গাছগুলো অনেক পুরোনো, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে ওরা । তবে সারা অঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ততার ছাপ । মনে হয় আমেরিকার ইতিহাস ওদের নখদর্পনে । ত্রিশ ফুট পর পর একেকটা গাছ, যেমনি চওড়া তেমনি উঁচু । শীতকাল আসছে বলে গছের পাতাও পড়তে শুরু করেছে । সারাটা পথ পাতায়-পাতায় ভরে আছে আর সেই পাতা মারিয়ে আমি হেঁটে চলেছি ।

গলির শেষ মাথায় আমাদের বাসা । তাকিয়ে দেখি রুমি ঢুকছে গাড়ি নিয়ে । আমাকে দেখতে পায়নি । দেখতে পেলে ঠিক ঠিক উঠিয়ে নিতো ।

নীরবে হেঁটে চলেছি । আশেপাশে কেউ নেই । শীত পড়ছে বলে মা-রা বাচ্চা নিয়ে বের হতে সাহস করেনি । অন্য সময়ে দেখতাম মা-রা বাচ্চা নিয়ে খেলছে আর পেছনে ঘুর ঘুর করছে পোষা-কুকুরের ছানা ।

দেখতে দেখতে বাড়ির কাছে চলে এসেছি । দূর থেকে দেখলাম, ছিপছিপে-লম্বা একটা মানুষ পাশের গলিতে ঢুকছে হন হন করে । তারপর নিমিষেই মিলিয়ে গেল । লোকটা যেমনি লম্বা তেমনি শুকনো, শীত ঢাকবার জন্য মুখে মাফলার পেচিয়েছে । কি মনে হলো আমার, আমি দৌড় দিলাম । এত জোড়ে দৌড় কখনো দিয়েছি বলে মনে পড়ে না । হাপাতে হাপাতে লোকটার কাছে চলে এসেছি । কাছে আসতেই লোকটা ঘুরে দাড়ালো । দেখি, বয়স্ক একজন মানুষ । বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে কিন্তু কোথাও কোন দুঃখ নেই ।

আমাকে দেখে হেসে বললো, গুড ইভনিং ম্যাডাম, তোমার জন্য কি কিছু করতে পারি ?
আমি কোন উত্তর দিলাম । ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম লোকটার দিকে ।
কিছুক্ষণ পর লোকটা আবারও বললো, তোমার জন্য কি কিছু করতে পারি ?
এবারও কোন উত্তর দিলাম না । মাথা নিচু হয়ে গেছে আমার তারপর আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম ।

শেষ

Please write your comments: sayed.hossain@yahoo.com
Personal homepage: www.sayedhossain.com
Sept 29, 2011
Dallas.